ট্রেজার আইল্যান্ড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

ANIK

সবা প্রকাশনা

FUAD

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের অমর কাহিনী

রূপান্তর করেছেন

রকিব হাসান

গল্পটি বলছে কিশোর জিম।
ওদের সরাইখানা অ্যাডমিরাল বেনবোয় এসে উঠলো
বেয়াড়া, কর্কশ স্বভাবের এক নাবিক।

কাদের ভয়ে যেন আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে লোকটা সারাক্ষণ।
জিমকে বললো, এক-পা খোঁড়া কোন নাবিক দেখলে
যেন চট করে খবর দেয় তাকে।

কিন্তু কিছুতেই কোন লাভ হলো না—
বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারলো না বেচারা,
ঠিকই খুঁজে বের করলো ওকে দুর্ধর্ষ একদল জলদস্যু।

এরপর থেকে আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটতে শুরু করলো
জিমের জীবনে। শেষে জাহাজে চেপে
চললো সে রত্নদ্বীপে। এমন সব অভিজ্ঞতা
সঞ্চয় করলো, যা বর্ণনা করে
অমর হয়ে গেছেন স্টিভেনসন।

দশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো-রুম ঃ ৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

যে কাহিনী বিশ্ব-বিখ্যাত করেছিল রচয়িতা
রবার্ট লুই স্টিভেনসনকে

রকিব হাসান

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

TREASURE ISLAND
By Raqib Hassan

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

এক

বুড়ো নাবিক

অনুরোধ এড়াতে পারলাম না কিছুতেই। হাজার হলেও স্কয়ার ট্রেলনী এবং ডাক্তার লিভসী ভদ্র, গণ্যমান্য লোক। আমারও যে লেখার ইচ্ছে একেবারেই নেই, তা নয়। এমন ঘটনা তো আর হরহামেশা ঘটে না। অনেক রোমাঞ্চকর মজার মজার গল্প-কেচ্ছা শুনেছি, কিন্তু গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বাস্তবে সঞ্চয় করে বসবো, ভাবিনি।

সত্যিই কিন্তু কিছু ধনরত্ন এখনও রয়ে গেছে ট্রেজার আইল্যাণ্ডে। লোভের হাত বাড়িয়ে আবার গিয়ে সেই দ্বীপে পাইকারি খুনখারাপী করুক রত্নসন্ধানী মানুষ, কিছুতেই চাই না। আর চাই না বলেই ঠিকানাটা গোপন রাখতে বাধ্য হচ্ছি। সতেরোশো'—সালের—তারিখ। এক অশুভক্ষণে আমাদের সরাইখানা 'অ্যাডমিরাল বেনবো'-য় এসে হাজির হলো বুড়ো।

হঠাৎ, নিতান্ত অস্বাভাবিকভাবেই আমাদের সরাইখানায় এসে উঠলো বুড়ো নাবিকটি। গালে একটা গভীর কাটা দাগ। লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ। চামড়ার রঙ রোদে পোড়া তামাটে। কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে কালো চুলের খাটো করে বাঁধা বেণী। রুক্ষ দুই হাতে ক্ষয়ে যাওয়া আঙ্গুল।

নখগুলো ভাঙা, কালো। ধারালো তলোয়ারে কেটে যাওয়া গালের দাগটা বীভৎস রকমের সাদা। গায়ে পুরোনো ময়লা নীল কোট।

যেন মাত্র গতকাল ঘটেছে ঘটনাটা। পরিষ্কার মনে পড়ছে, এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সরাইখানার দরজার দিকে এগিয়ে আসছে সে। পেছনে ঠেলা গাড়িতে বয়ে আনা হচ্ছে তার সিন্দুকটা। শিস্ দিতে দিতে আসছে বুড়ো। সুরটা অচেনা। কিন্তু এই অচেনা সুরই পরে দারুণ চেনা হয়ে গিয়েছিল আমার। গানটাও:

"সিন্দুকটা মরা মানুষের
চড়াও হলো পনেরো নাবিক,
আরেক বোতল রাম নিয়ে আয়
ইয়ো হো- হো, কী মজা।।"

ভাঙা ভাঙা কিন্তু চড়া বুড়োটে গলায় সে গায় এই গান। জাহাজীদের গান।

দরজার কাছে এসে হাতের ছোট লাঠি দিয়ে পাল্লায় ঠক ঠক আওয়াজ তুললো লোকটি। বাবা উঁকি দিল। কর্কশ গলায় এক গ্লাস রামের অর্ডার দিল সে। পানীয়টা এলে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে পাহাড়ের চূড়োর দিকে তাকালো। তাকালো আমাদের সাইনবোর্ডটার দিকেও।

'দারুণ জায়গা!' মন্তব্য করলো লোকটি, 'তা এখানে লোকজন আসে কেমন?'

খুবই কম আসে, আফসোস করে জানালো বাবা।

'ভাল,' বললো লোকটি। 'আমার উপযুক্ত জায়গা।' ঠেলাওয়ালার দিকে ফিরলো সে, 'সিন্দুকটা তুলে দাও। এখানে কিছুদিন থাকবো।' বাবাকে বললো, 'সাদাসিধে মানুষ আমি। শুয়োরের মাংস, ডিম আর রাম হলেই চলে যাবে। ঘর কিন্তু ওপরতলায় চাই। জাহাজের আসা-

যাওয়া দেখবো। আর হ্যাঁ, আমাকে ক্যাপ্টেন বলে ডাকবে···,' পকেট থেকে গোটা চারেক মুদ্রা বের করলো। মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'শেষ হয়ে গেলেই জানাবে।' জাঁদরেল কমাণ্ডারের ভঙ্গি তার।

পোশাকের দুরবস্থা দেখে ক্যাপ্টেন গোছের অফিসার বলে মনে হয় না তাকে। কিন্তু কর্কশ গলা আর বাচন-ভঙ্গিতে বোঝা যায় আদেশ দিতে এবং দুর্ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত এই লোক।

ঠেলাওয়ালার কাছ থেকে জানতে পারলাম ডাকগাড়িতে করে সকালে এসে রয়াল জর্জে নেমেছে বুড়ো। সৈকতের কাছাকাছি নির্জন সরাইখানার খোঁজ করছিল। অ্যাডমিরাল বেনবো'র নাম শোনে ওখানেই, এবং পছন্দ করে ফেলে। এর বেশি আর কিছু জানে না ঠেলাওয়ালা।

সময় যায়। লোকটার ব্যবহারে অবাকই হচ্ছি শুধু। সাংঘাতিক চাপা স্বভাবের মানুষ। সারাটা দিন দোতালার বারান্দায় কিংবা কাছের পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসে থাকে। পিতলের দুরবীন দিয়ে চেয়ে থাকে সাগরের দিকে। সন্ধ্যা হলেই এসে ঢোকে সরাইয়ের হলে। একেবারে আগুনের পাশে এসে বসে। কড়া মদ গেলে। কারও সঙ্গেই কথা বলে না। কেউ কোনো প্রশ্ন করে ফেললে চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকায়। মানে মানে সরে যায় কৌতূহলী প্রশ্নকর্তা। সরাইখানায় যারা আসর জমাতে কিংবা অন্য কাজে আসে, শিগগিরই বুঝে গেল, এই বিশেষ লোকটিকে না ঘাঁটানোই সবদিক থেকে নিরাপদ।

আমার সঙ্গে অবশ্য একআধটা কথা বলে আজব নাবিক। রোজই পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে, অন্য কোনো নাবিক সরাইখানায় এসেছে কিনা। কিংবা এই পথ ধরে গেছে কিনা।

প্রথমে অনুমান করেছি, বুঝি তার কোনো সঙ্গীর আসার কথা

আছে, তারই কথা জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু তা নয়, পরে বুঝতে পেরেছি। ব্রিস্টলে যাবার পথে কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের সরাইতে কোনো নাবিক এলে খেয়াল করেছি, হলঘরের পর্দা ফাঁক করে দেখে নেয় ক্যাপ্টেন। এমনিতেই সে কথা বলে কম, তখন একেবারে চুপ মেরে যায়।

আচমকা আমাকে একদিন ডেকে বললো ক্যাপ্টেন, কোনো খোঁড়া নাবিকের দেখা পেলে যেন তাকে অবশ্যই জানাই। এর জন্যে মাসে চার পেনি করে বেতন দেবে সে আমাকে।

যতটা না পয়সার জন্যে, তার চেয়ে অনেক বেশি কৌতূহল মেটাবার জন্যে একপেয়ে নাবিকের সন্ধানে রইলাম। সরাইখানায় লোক আসে, লোক যায়। কিন্তু খোঁড়া নাবিক আর আসে না।

সারাক্ষণই খোঁড়া নাবিকের কথা ভাবি। তার চেহারা চালচলনের নানারকম ছবি আঁকি মনে মনে। ফল যা হবার হলো। দুঃস্বপ্নে দেখা দিতে আরম্ভ করলো এক ভয়ানক চেহারার একপেয়ে নাবিক। এই দুঃস্বপ্ন বেশি দেখি দুর্দান্ত ঝড়ের রাতে। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার তাড়া খেয়ে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে পাথুরে পাহাড়ের গোড়ায়। কেঁপে কেঁপে উঠে যেন গুটিসুটি মেরে যায় আমাদের দ্বিতল বাড়িটা। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে কম্বলের তলায় লুকোই আমি। দুঃস্বপ্নে ভয়াল দানবের মতোই ক্রাচে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে তাড়া করে আমাকে খোঁড়া নাবিক। প্রাণপণে দৌড়াতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না —পা পিছলে যায়; এদিকে এগিয়ে আসতে থাকে সে, কোনো বাধাকেই বাধা মনে করে না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার, এতসব দুঃস্বপ্নের পরিবর্তে মাসিক চার পেনি কিছুই না।

ক্যাপ্টেনকে আমি তেমন ভয় না করলেও আর সবাই করে। প্রায় প্রতি রাতেই প্রচুর রাম খেয়ে মাতলামি শুরু করে সে। কাউকে

পরোয়াই করে না এই সময়। বিচ্ছিরি সব গান ধরে। কখনও কখনও উপস্থিত শ্রোতাদের জন্যে মদের অর্ডার দেয়, তারপর শংকিত লোকগুলোকে গল্প শুনতে কিংবা তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'কোরাস' গাইতে বাধ্য করে। তার সেই গান 'ইয়ো-হো-হো, কী মজা'-র ঝংকারে কেঁপে ওঠে আমাদের বাড়ি। ভয়ে ভয়ে তার সঙ্গে গানে যোগ দেয় সবাই। কার চেয়ে কে বেশি চেঁচাতে পারে যেন তারই প্রতিযোগিতা। আচমকা হয়তো থেমে যায় নাবিক। জোরে টেবিলে চাপড় মেরে শব্দ করে থামিয়ে দেয় অন্যদেরও। তারপর শুরু হয় গল্প। তার কথার মাঝে কেউ প্রশ্ন করে বসলে ক্ষেপে যায়। আবার সবাই চুপচাপ থাকলেও রেগে ওঠে সে—ধরে নেয় তার গল্পের প্রতি অবহেলা দেখানো হচ্ছে। কাউকেই ঘর থেকে বেরোতে দেয় না সে এই সময়। গেলাসে চুমুক দিতে দিতে একটানা গল্প বলে যায়, যতক্ষণ না নেশায় জড়িয়ে আসে তার কণ্ঠ, যতক্ষণ না ঢলে পড়ে যায়। তারপর ছুটি পায় শ্রোতারা।

ক্যাপ্টেনের গল্প শুনে দারুণ ভয় পায় লোকে। ভয়ানক সে-সব গল্প। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার বিবরণ, দূর সাগরে প্রচণ্ড ঝড়ের বর্ণনা, স্পেনীয় সাগরে ভয়াবহ নৃশংসতার কাহিনী, ইত্যাদি হলো তার বিষয়-বস্তু। বিবৃতি থেকেই বোঝা যায় সাগরবক্ষে ভয়ংকর সব পিশাচ-মানুষের সঙ্গে জীবন কেটেছে তার। ভয়াবহ এসব কাহিনী শুনতে শুনতে ভয়ে সিঁটিয়ে যায় আমাদের গেঁয়ো লোকেরা। বাবার আশংকা, ক্যাপ্টেনের ভয়ে সরাইয়ে খরিদ্দার আশা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম। রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে ভালবাসে মানুষ। তাছাড়া ক্যাপ্টেনের পয়সায় মদ গিলতে পেয়ে বরং খুশিই হয় গ্রামবাসীরা। কিছু কিছু যুবক তো নাবিকের ভক্তই হয়ে উঠেছে। 'দুর্দান্ত জাহাজী', 'পোড়-খাওয়া বুড়ো', ইত্যাদি খেতাব দিয়েছে ক্যাপ্টেনকে তারা। এইসব

নাবিকই নাকি ইংল্যাণ্ডের গৌরব।

সময় যায়। কাটে দিন, পেরিয়ে যায় সপ্তাহ, আসে মাস। একে একে কেটে যায় কয়েক মাস। জমানো টাকা সব খরচ হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। সরাইয়ের বিল বইয়ে তার নামে বাকি পড়তে লাগলো। কিন্তু যাবার নাম নেই নাবিকের। টাকাও চাওয়া যায় না। চাইলেই নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ তুলে চোখ পাকিয়ে তাকায়। হাত কচলে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া তখন আর কিছুই করতে পারে না বাবা। বাবার অকাল মৃত্যুর এটাও একটা কারণ হতে পারে।

ক্যাপ্টেনের সব কিছুই অদ্ভুত। সরাইয়ে আসা পর্যন্ত কক্ষণো পোশাক বদলাতে দেখলাম না তাকে, কেবল মোজা ছাড়া। এখানে এসে কোনো পোশাক কেনেওনি, ওই মোজা ছাড়া। টুপির একটা ধার ভেঙে গেল একদিন, কিন্তু সারালো না। আর কোটের তো চেহারাই বদলে ফেললো তালি মেরে মেরে। ছিঁড়ে গেলেই সূঁচসুতো নিয়ে বসে যায়। নিজেই তালি লাগায় ছেঁড়া জায়গায়। আসা পর্যন্ত কাউকে চিঠি লিখলো না সে, কারও কাছ থেকে চিঠি পেলও না। নেশার ঘোরে ছাড়া পারতপক্ষে কথাও বলতে চায় না লোকের সঙ্গে। আর সিন্দুকটা, ঈশ্বরই জানেন কি আছে ওতে—ক্যাপ্টেনকে খুলতে দেখলাম না কখনও।

নতুন ঘটনা ঘটলো একদিন। বাবার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। সাঁঝের পরে তাকে দেখতে এলেন ডাক্তার লিভসী। রাত হয়ে গেল। ডাক্তারচাচাকে খেয়ে যেতে বললো মা। এড়াতে না পেরে আমাদের এখানেই ডিনার সারলেন তিনি। তারপর বিদায় নিয়ে নেমে এলেন হলরুমে। আমাদের আস্তাবল নেই, ঘোড়াও নেই। নিজের ঘোড়া আসার অপেক্ষায় আছেন তিনি। ছিমছাম পোশাক পরা, বুদ্ধিদীপ্ত

এই লোকটির উজ্জ্বল কালো দুই চোখের তারায় হাসি যেন উপচে পড়ে। আমাদের গেঁয়ো প্রতিবেশী আর নোংরা, কাকতাড়ুয়ার মতো চেহারার নাবিকের পাশে বড়ই বেমানান এই গণ্যমান্য লোকটি। তবে যে কোনো লোকের সঙ্গে সহজ ভাবে মেশার ক্ষমতা তাঁর অপরিসীম।

পাইপ টানতে টানতে বুড়ো মালি টেলরের দিকে তাকালেন ডাক্তারচাচা। দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছে বুড়ো। মালি তাঁর দিকে চাইতেই হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন।

টেবিলে দু'হাত ছড়িয়ে বসে আছে চুর-মাতাল ক্যাপ্টেন। বহুবার গাওয়া সেই গানটি গেয়ে উঠলো হঠাৎ ঃ

"সিন্দুকটা মরা মানুষের
চড়াও হলো পনেরো নাবিক,
আরেক বোতল রাম নিয়ে আয়
ইয়ো-হো-হো, কী মজা ॥"

প্রথমে ভেবেছি, তার ঘরের সিন্দুকটার কথাই বলে। এই চিন্তাটা দুঃস্বপ্নে খোঁড়া নাবিকের তাড়া-করা দৃশ্যের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। নাবিক আসার পর এতবার শুনেছি, শেষদিকে আর বিশেষ আমল দিই না গানটাকে। কিন্তু ডাক্তার লিভসীর কাছে ব্যাপারটা নতুন। স্বভাবতই বিরক্ত হলেন তিনি। রাগতঃ চোখে একবার তাকালেন ক্যাপ্টেনের দিকে। তারপর বুড়ো মালি টেলরের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন আবার।

এদিকে ক্রমেই গানে মাতোয়ারা হয়ে উঠছে নাবিক। শেষে, জোরে টেবিল চাপড়ে উঠলো। এর অর্থ জানি আমরা। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলাম। কিন্তু ডাক্তার সাহেব জানেন না। কথা বলছেন তিনি, ফাঁকে ফাঁকে পাইপ টানছেন। চোখ পাকিয়ে তাঁর দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন,

তারপর আরও জোরে টেবিল চাপড়ালো। ধমকে উঠলো, 'চো-ও-ও-প!'

'আমাকে বলছেন?' চোখ তুলে তাকালেন ডাক্তারচাচা।

গাল দেবার মতো করে জানালো নাবিক, ডাক্তারচাচাকেই বলছে সে।

'একটা কথা না বলে পারছি না আপনাকে,' বললেন ডাক্তারচাচা, 'এভাবে রাম খেতে থাকলে, শিগগিরই একটা শয়তানের হাত থেকে বাঁচবে পৃথিবী।'

ভীষণ ক্ষেপে গেল নাবিক। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ছুরি বের করে ফেললো। হাতের চেটোর ওপর নিয়ে ভারসাম্য পরীক্ষা করতে করতে হুঁশিয়ার করলো, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ডাক্তারচাচাকে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলবে।

বিচলিত হলেন না ডাক্তারচাচা। শান্ত, কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে ঘরের সব লোককে শুনিয়ে নাবিককে বললেন, 'পকেটে ঢোকান ছুরিটা। নইলে ফাঁসিতে ঝুলবেন।'

দু'জনের মাঝে দৃষ্টির লড়াই শুরু হলো। শিগগিরই হেরে গেল ক্যাপ্টেন। দৃষ্টি নত করলো। ছুরিটা রেখে দিল। তারপর বসে পড়ে মার-খাওয়া কুকুরের মতো গোঁ গোঁ করতে লাগলো।

'দেখুন,' বললেন ডাক্তারচাচা। 'আপনার মতো একটি জীব এই এলাকায় আছে, জেনে গেছি। এরপর থেকে নজর থাকবে আমার। কেবল ডাক্তার নই, আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেটও। কথাটা মনে রাখবেন।'

একটু পরেই ঘোড়া এসে গেল। চলে গেলেন ডাক্তার লিভসী। সে রাতে আর কোনোরকম গোলমাল করলো না ক্যাপ্টেন। এরপরের

কয়েক রাত্তেও চুপচাপই থাকলো সে।

দুই

ব্ল্যাক ডগ

শীত এসে গেল। দ্রুত বাড়ছে ঠাণ্ডা। প্রচণ্ড তুষারপাত তো আছেই, সেই সঙ্গে প্রবল ঝড়। ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে বাবার অবস্থা। বোঝা যাচ্ছে, এই শীত কাটিয়ে উঠতে পারবে না। বাবা শয্যাশায়ী, ফলে, সরাইয়ের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার আর মা'র ওপর। ব্যস্ততার মাঝে অবাঞ্ছিত অতিথিটির দিকে বিশেষ নজর দিতে পারছি না।

জানুয়ারী মাসের একদিন। ভোর হয়েছে। ভয়ংকর শীত। পাহাড়ের পাথুরে পাদদেশে ঢেউ আছড়ে পড়ার মৃদু ছলাৎ-ছল শব্দ। দিগন্তে উঁকি দিয়েছে সূর্য। রশ্মিগুলো সাগরের পানি ছুঁয়ে ছুটে এসে স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চূড়া। অন্যান্য দিনের চেয়ে আগে উঠেছে ক্যাপ্টেন। ছুরিটা কোটের তলায় লুকিয়ে, বগল তলায় পিতলের দূরবীন নিয়ে সাগর তীর ধরে এগিয়ে চলেছে। হ্যাটটা পেছন দিকে হেলানো। কনকনে বাতাসে ধোঁয়া হয়ে বেরোচ্ছে তার নিঃশ্বাস। পাথরের বড় চাঁইটা পেরোবার সময় নাকের ভেতর থেকে বিচিত্র ক্রুদ্ধ শব্দ উঠলো, যেন ডাক্তার লিভসীর কথা মনে পড়ে গেছে তার।

মা উপরে, বাবার কাছে। ফিরে এলে খাবে, তাই ক্যাপ্টেনের জন্যে নাস্তার যোগাড় করছি আমি। এই সময় হলঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলো একজন লোক। তাকে এর আগে কখনও দেখিনি। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, লম্বাটে গড়নের। বাঁ হাতে দুটো আঙুল নেই। সঙ্গে একটা ছুরি আছে, দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মারামারি খুব একটা করতে পারে বলে মনে হলো না। জাহাজীদের দিকে আমার কড়া নজর, আগেই বলেছি। লোকটাকে ঠিক জাহাজী মনে হচ্ছে না, কিন্তু গায়ে সাগরের গন্ধ একেবারেই নেই, তাও বলা যায় না।

তার জন্যে কি করতে পারি জিজ্ঞেস করায়, রাম চাইলো সে। অর্ডার সরবরাহের জন্যে রওনা দিলাম। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো আগন্তুক। ফিরে চাইতেই ইশারায় কাছে ডাকলো আমাকে। তোয়ালেটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কাছে এসো খোকা,' ডাকলো সে। 'এই এখানে।'

এক পা এগোলাম।

চোখের ইঙ্গিতে ক্যাপ্টেনের জন্যে সাজানো টেবিল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওগুলো আমার বন্ধু বিলের জন্যে, না?'

বললাম, আমি তার বন্ধু বিলকে চিনি না। তবে খাবারগুলো আমাদের একজন খরিদ্দারের জন্যে। তাকে ক্যাপ্টেন বলে ডাকি আমরা।

'বিলকে ক্যাপ্টেন ডাকা যায়। ডান গালে একটা কাটা দাগ আছে তার। ব্যবহার চমৎকার, মাতাল হলে তো কথাই নেই। সে যাকগে। তা দোস্ত কি ঘরেই আছে?'

বেড়াতে বেরিয়েছে, জানালাম।

'কোন্ দিকে?'

পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করলাম। কোন্ পথে, কখন ফিরতে পারে,

ধারণা দিলাম। এটাওটা আরও কিছু প্রশ্নের জবাবও দিতে হলো।

'তা ভাল,' বললো আগন্তুক।

মুখের ভাব দেখে কিন্তু ভাল বোধ হলো না। কি করবো, বুঝতে পারছি না। সরাইয়ের বাইরে বেরোলো আগন্তুক। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে উঁকি মেরে সরাইয়ের কোণের ওদিকে দেখছে। ইঁদুরের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে বেড়াল। আমিও বেরোলাম। রাস্তায় উঠতে যাচ্ছি, ডেকে ফেরালো আমাকে। দ্বিধা করায় রাগের চিহ্ন ফুটলো চেহারায়। বকা দিয়ে উঠলো। দ্রুত ফিরে চলে এলাম। রাগের চিহ্ন মুছে গেল আবার তার চেহারা থেকে। পিঠ চাপড়ে বললো, 'এই তো লক্ষ্মী ছেলে। খুব ভাল তুই। তোর মতো আমারও একটা ছেলে আছে। তাকে নিয়ে আমার গর্ব। কিন্তু কি জানিস, ছোটদের সবচে বড়গুণ হচ্ছে বড়দের কথা মেনে চলা। বিলের জাহাজে কাজ করলে অনেক আগেই শিখে যেতি এসব···ওই তো, আসছে বিল। ওমা, হাতে দূরবীনটাও আছে দেখছি! তা চল্ তো বাবা, কোথাও লুকোই। ওকে চমকে দিতে হবে।'

আমাকে ঠেলে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো আগন্তুক। ঘরের কোণে লুকালো। আমাকে রাখলো তার পেছনে। অস্বস্তি বোধ করছি। ভয়ও পাচ্ছি। দেখে মনে হলো লোকটাও ভয় পাচ্ছে। এতে ভীতি আরও বাড়লো আমার। হাতল ধরে টেনে খাপের ভেতরে ছুরির ফলাটা আলগা রাখলো সে। গলায় যেন রুটির দলা আটকেছে, বারবার ঢোক গিলছে।

ঘরে ঢুকেই পেছনে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিল ক্যাপ্টেন। ডানে-বাঁয়ে কোনোদিকে তাকালো না। সোজা তার জন্যে রাখা খাবারের দিকে এগিয়ে গেল।

'বিল!' জোর করে গলার স্বর গম্ভীর রাখার চেষ্টা করছে আগন্তুক।

পাঁই করে ঘুরলো ক্যাপ্টেন। বিবর্ণ হয়ে গেল মুখ। নাকের ডগা নীলচে হয়ে উঠলো। সামনে যেন ভূত দেখছে সে। এক মুহূর্তে যেন আরও বেশি বুড়িয়ে গেছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার জন্যে বলতে কি, করুণাই হলো আমার।

'পুরোনো জাহাজী বন্ধুকে চিনতে পেরেছো তো, দোস্ত?' বললো আগন্তুক।

'ব্ল্যাক ডগ!' গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোতে চাইছে না ক্যাপ্টেনের।

'তো আর কে?' সহজ হয়ে আসছে আগন্তুক। নাটকীয়ভাবে বললো, 'ব্ল্যাক ডগই আমি, এসে হাজির হয়েছি অ্যাডমিরাল বেনবোয়। পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে, দোস্ত? কি দিনই ছিল সে-সব! হাতের আঙ্গুল দু'টো হারালাম আমি,' বাঁ হাতটা তুলে দেখালো সে।

'তা চট করে বলে ফেল্ তো, কি জন্যে এসেছো?'

'বলছি,' বললো ব্ল্যাক ডগ, 'কিন্তু আগে এক গেলাস রাম খাওয়া যাক। খোকা···,' আমার দিকে চাইতেই রওনা দিলাম। ক্যাপ্টেনকে বলছে ডগ, 'দারুণ ছেলে!'

রাম নিয়ে ফিরে এলাম। টেবিলে দু'জনে মুখোমুখি বসেছে। দরজার দিকে পাশ ফিরে বসেছে ব্ল্যাক ডগ। বন্ধুর ওপর চোখ রাখতেও সুবিধে, দরকার পড়লে চট করে পালিয়ে যাওয়াও সহজ।

আমাকে চলে যেতে বললো ব্ল্যাক ডগ। হুঁশিয়ার করে দিল, যেন কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে ওদের দিকে চোখ রাখার কিংবা কোনো কথা শোনার চেষ্টা না করি।

বারের ভেতরে চলে এলাম। কান খাড়া রাখলাম ঠিকই। নিচু

গলায় কথাবার্তার আওয়াজ পাচ্ছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। আস্তে আস্তে স্বর চড়তে লাগলো। দু'একটা শব্দ বুঝতে পারছি এখন। গালাগালি করছে ক্যাপ্টেন।

হঠাৎ শুরু হলো চেঁচামেচি। ইস্পাতে ইস্পাতে আঘাতের শব্দ হলো। ছিটকে পড়লো চেয়ার টেবিল। একটা আর্তনাদ শোনা গেল। বারের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি দরজার দিকে ছুটেছে ব্ল্যাক ডগ। তার পেছনে খোলা ছুরি হাতে তাড়া করছে ক্যাপ্টেন। ব্ল্যাক ডগের হাতেও ছুরি। কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ব্ল্যাক ডগ। ধরতে পারবে না বুঝে ছুরি ছুঁড়ে মারলো ক্যাপ্টেন। লাগলে ওখানেই শেষ হয়ে যেত ডগ। কিন্তু তার কপাল ভাল। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে সাইনবোর্ডটায় গিয়ে বিঁধলো ছুরি। আজও সেই চিহ্ন আছে আমাদের সাইনবোর্ডে।

আধ মিনিটেই পাহাড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল ব্ল্যাক ডগ। কিছু-ক্ষণ সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে রইলো ক্যাপ্টেন। চোখের ওপর হাত বোলালো কয়েকবার। তারপর ফিরে দাঁড়ালো। আমাকে বললো, 'জিম, রাম! জলদি!' বলতে বলতে টলে উঠলো সে। দেয়ালে হাত রেখে কোনোমতে সামলে নিল।

'কোথাও লেগেছে?'

'রাম! রাম আনো জলদি! পালাতে হবে আমাকে!'

রাম আনতে ছুটলাম। ব্যাপারটার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে গেছি। একটা গেলাস ভাঙলাম। মাথার ভেতর কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। বসার ঘরে ভারি কি পতনের শব্দে চমকে বার থেকে দৌড়ে বেরোলাম। দেখি, মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্যাপ্টেন।

হট্টগোল শুনে দোতালা থেকে নেমে এসেছে মা। দু'জনেই ছুটে

গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে। পাশে বসে তার মাথাটা তুলে ধরলাম। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ক্যাপ্টেনের। মুখ ফ্যাকাসে, চোখ বন্ধ।

'কি যে শুরু হলো ছাই!' কেঁদেই ফেলবে যেন মা, 'এদিকে তোর বাবার এই অবস্থা!'

কি করে সাহায্য করবো ক্যাপ্টেনকে বুঝতে পারছি না। মারপিট করতে গিয়ে শরীরের কোথাও মারাত্মক আঘাত পেয়েছে? রাম এনে গেলাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বদ্ধ দাঁতের ফাঁক দিয়ে গলানো গেল না তরল পদার্থটুকু। এই সময় বাবাকে দেখতে এলেন ডাক্তার লিভসী। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

'দেখুন তো,' বললাম সমস্বরে, 'কোথায় চোট লেগেছে?'

'চোট-ফোট কিচ্ছু না। আসলে স্ট্রোক হয়েছে ওর। আগেই সাবধান করেছিলাম। মিসেস হকিন্স, আপনি ওপরে চলে যান। আপনার স্বামী অসুস্থ। কোনো কথা জানাবেন না তাঁকে। একে কি করা যায় দেখছি আমি। জিম, একটা বোল নিয়ে এসো তো।'

বোল নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম, ক্যাপ্টেনের কোট-শার্টের আস্তিন ছিঁড়ে ফেলেছেন ডাক্তারচাচা। পেশিবহুল হাত বেরিয়ে পড়েছে। হাতে উল্কিতে লেখা রয়েছে: 'হিয়ার'স্ লাক', 'এ ফেয়ার উইণ্ড', 'বিলি বোন্স্ হিজ ফ্যান্সি।' বাহুর ওপরে, কাঁধের কাছে আঁকা একটা ছবি। ফাঁসিতে ঝুলছে একজন মানুষ।

'জলদস্যুদের সাংকেতিক চিহ্ন,' ছবিটা দেখিয়ে মন্তব্য করলেন ডাক্তারচাচা। 'জিম, রক্ত দেখলে ভয় পাবে না তো?'

'জ্বী, না।'

'গুড। বোলটা ধরো,' বলেই নাবিকের হাতের শিরায় ডাক্তারী-ছুরি দিয়ে খোঁচা মারলেন।

অনেকখানি রক্ত বেরিয়ে যাবার পর চোখ খুললো ক্যাপ্টেন। ঘোলাটে চোখে তাকালো চারদিকে। ডাক্তারচাচার দিকে চেয়ে ভুরু কোঁচকাল। আমার দিকে চেয়ে খানিকটা স্বস্তি পেল যেন। কিন্তু হঠাৎ-ই আবার বিবর্ণ হয়ে গেল চেহারা। শরীরটাকে তোলার চেষ্টা করে বললো, 'ব্ল্যাক ডগ? কোথায়?'

'ওসব ডগ-ফগ কিছু নেই এখানে,' বললেন ডাক্তারচাচা, 'স্ট্রোক হয়েছিল আপনার। বেশি রাম খাবার ফল। ইচ্ছা একেবারেই ছিল না, তবু গোর থেকে ফিরিয়ে আনা হলো আপনাকে এইমাত্র। তা বোন্‌স্‌...'

'...আমার নাম বোন্‌স্‌ নয়,' বাধা দিয়ে বললো নাবিক।

'তর্ক করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। নামটা আপনার হাতে লেখা রয়েছে। সে যাকগে। আবার হুঁশিয়ার করছি, এরপর রাম খেলে...তা এক-আধ গেলাস খেলে তেমন ক্ষতি হবে না, কিন্তু আপনি তো খেতেই থাকবেন। তাহলে আর সাগর দেখতে হবে না বেশি-দিন। বোঝা গেছে?'

হ্যাঁ-না কিছুই বললো না নাবিক।

'চলুন, আরেকটু সাহায্য করি আপনাকে,' আমার দিকে ফিরলেন ডাক্তারচাচা। 'জিম, এসো, হাত লাগাও।'

ধরে কোনোমতে দোতালায় তার ঘরে নিয়ে গেলাম নাবিককে। বিছানায় শুইয়ে দিলাম। বালিশে মাথা রেখে একেবারে নেতিয়ে পড়লো সে। জ্ঞান হারালো নাকি?

না, হারায়নি। ডাক্তারচাচার কথায় চোখ মেলেছে, 'আবারও সাবধান করছি, রাম ছাড়ুন। নইলে খুব দ্রুত পৌঁছে যাবেন কবরে।'

আমাকে নিয়ে নাবিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তারচাচা।

বাবাকে দেখতে যাবেন এবার।

বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'জিম, যে কোনো লোক যত খারাপ হোক, অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারের কাছে তার একটাই পরিচয়—রোগী। শোনো, ওকে রাম দিও না আর। ড্রিংক চাইলে, শরবত দেবে। ওর পুরোপুরি রেস্টের প্রয়োজন এখন। আর একটা স্ট্রোক হলেই শেষ...'

তিন

কালো মার্কা

বারোটা নাগাদ শরবত আর ওষুধ নিয়ে গেলাম নাবিকের ঘরে। তেমনি পড়ে আছে নাবিক। বিছানার সঙ্গে মিশে আছে একেবারে। সাংঘাতিক দুর্বল। কিন্তু চেহারায় পরিষ্কার উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম।

বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ মেললো নাবিক। ক্লান্ত মৃদুকণ্ঠে বললো, 'তুমি ছাড়া এখানকার সবাই অমানুষ, জিম। তাই তোমার সঙ্গে সব সময় ভাল ব্যবহার করেছি। অসহায় মানুষের একটা অনুরোধ রাখবে?' করুণ আবেদন নাবিকের চোখের তারায়। 'আমাকে ...খানিকটা রাম এনে দেবে? এই একটুখানি?'

'কিন্তু ডাক্তারচাচা...'

'ওসব ডাক্তার-ফাক্তারের কথা ছাড়ো,' মৃদু গলায় বললো নাবিক। 'এরা কি জানে? দুনিয়া দেখেছি আমি। পাথরফাটা গরম দেখেছি...

পীতজ্বরে তল্লাট সাফ হয়ে যেতে দেখেছি···ভূমিকম্পে পাহাড় বসে যেতে দেখেছি···আর ওই ব্যাটা ডাক্তার, হুঁহ্! যাকগে, জিম, প্লীজ, একটুখানি এনে দাও না আমাকে! ভাল হয়ে উঠলে আরও অনেক মজার গল্প শোনাবো। সোনার পুরো একটা গিনি দেবো। দাও না!'

'দেখুন,' ডাক্তারচাচা অনুকরণে হুঁশিয়ার করলাম আমি নাবিককে। 'বেশি রাম খেলে মারা যাবেন আপনি। এতে একটা বাজে কেলেংকারি হয়ে যাবে হোটেলে। এদিকে বাবার শরীর খুবই খারাপ। এই অবস্থায় যে কোনো ধরনের উত্তেজনা তার জন্যে মারাত্মক। ঠিক আছে, এখন এক গ্লাস এনে দিচ্ছি। এরপর চাইলেও একটা ফোঁটাও পাবেন না আর।'

এনে দিলাম। গেলাসটা দেখে চকচক করে উঠলো নাবিকের চোখ। বালিশে ভর দিয়ে কোনোমতে আধশোয়া হলো সে। গেলাসটা তুলে দিলাম তার হাতে। ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে জ্বলন্ত তরল পদার্থটুকু গিলে ফেললো নাবিক।

'আহ্, চমৎকার! জানটা বাঁচলো! একটু শক্তিও পাচ্ছি মনে হচ্ছে। তা দোস্ত, ডাক্তার কি বলে? কতদিন শুয়ে থাকতে হবে এভাবে?'

'কমপক্ষে এক হপ্তা।'

'তারমানে কোনোদিনই আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবো না! এর আগেই তো ব্ল্যাক স্পট দিয়ে দেবে আমাকে ওরা। আমি কোথায়, কেমন আছি, নিশ্চয়ই ফাঁস হয়ে গেছে এতক্ষণে। নিজেদের ভাগ শেষ করে আমার দিকে নজর পড়েছে ওদের। তোমাকে চুপিচুপি বলছি··· কিছু টাকা আছে আমার। অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি। ওগুলো লুট করে নিতে চাইবে ওরা এবার। কিন্তু সেটা হতে দিচ্ছি না আমি কিছু-

তেই।'

বিছানা থেকে মাটিতে পা নামালো নাবিক। উঠে দাঁড়ালো। টলে উঠলো পরক্ষণেই। পড়ে যাচ্ছিলো, লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরলাম। আমার কাঁধ খামচে ধরে কোনোমতে টাল সামলালো নাবিক। তারপর ধপাস করে বসে পড়লো বিছানায়। হ্যাঁচকা টানে উবু হয়ে পড়লাম। দু'হাতে খামচে ধরলাম বিছানার কিনারা।

'ব্যাটা ডাক্তার!' গালাগাল দিল নাবিক। 'ওই ব্যাটাই আমার এই অবস্থা করেছে। ইস্‌স্‌, কান ভোঁ ভোঁ করছে।'

আমার সাহায্য নিয়ে বালিশে মাথা রেখে আবার ঠিক হয়ে শুলো নাবিক। মিনিটখানেক চোখ বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে রইলো। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর অবস্থা বিশেষ ভাল ঠেকছে না আমার।

চোখ খুললো নাবিক। আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন, 'জিম, খোঁড়া কোনো জাহাজীকে দেখেছো?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লাম।

'দেখোনি। কিন্তু ব্ল্যাক ডগকে তো দেখলে? পাজির পা-ঝাড়া। যারা তাকে পাঠিয়েছে, তারা তো এক একটা সাক্ষাৎ শয়তান। আমার শরীরের যা অবস্থা, যে-কোনো সময় একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। তোমাকে সেক্ষেত্রে একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে। ওদের নজর এটার ওপর,' ঘরের কোণে রাখা সিন্দুকটা দেখিয়ে বললো নাবিক, 'ওরা এলে ঘোড়া নিয়ে দ্রুত চলে যাবে অপদার্থ ডাক্তারটার কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট সে। পুলিশ নিয়ে এসে যেন গ্রেপ্তার করে ফ্লিন্টের দলের সব-ক'টাকে। জানো, ফ্লিন্টের জাহাজে ফার্স্ট মেট ছিলাম আমি···একমাত্র আমিই চিনি সেই জায়গাটা। সাভান্নায় মরতে বসেছিল ফ্লিন্ট। তার রোগশয্যার পাশে ছিলাম আমি। তখনই আমাকে জিনিসটা দেয় সে

···তা, যাকগে ওসব কথা। আমি যা বলছি করবে শুধু ওরা ব্ল্যাক স্পট দিলে, তবেই। আবার ব্ল্যাক ডগ এলে···আর হ্যাঁ, খোঁড়া নাবিকের দেখা পেলেও জানাবে ডাক্তারকে। এই খোঁড়াটা আরও অনেক বেশি ভয়ানক।'

'ব্ল্যাক স্পট কি, ক্যাপ্টেন?'

'মৃত্যু সমন। এলে জানাবো তোমাকে। সন্দেহজনক লোকের ওপর চোখ রাখবে এখন থেকে। কসম খাচ্ছি, আমার যা কিছু আছে, তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবো।'

আরও কিছুক্ষণ বক বক করলো নাবিক। ক্রমেই গলার স্বর নিস্তেজ হয়ে আসছে। ডাক্তারচাচার দেয়া ওষুধ দিলাম তাকে। বাচ্চা ছেলের মতোই আমার হাত থেকে নিয়ে খেলো। বললো, 'সত্যিই, ওষুধ বড় দরকার এখন আমার।' আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো নাবিক। গভীর ঘুম। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সেদিনই সন্ধ্যায় মারা গেল বাবা। ক্যাপ্টেনের চিন্তা সাময়িকভাবে আমার মন থেকে মুছে গেল। প্রচণ্ড শোক তো আছেই, তার ওপর প্রতিবেশীদের আসা যাওয়া, শেষকৃত্য, সরাইখানার দৈনন্দিন কাজকর্ম ইত্যাদি নিয়ে সাংঘাতিক ব্যস্ত রইলাম।

পরের দিনই কিন্তু নিচে নামলো ক্যাপ্টেন। খেলোও, কিন্তু অতি সামান্য। তবে রাম খেলো প্রচুর। বারে গিয়ে নিজে নিয়েই খেলো। তার মেজাজ দেখে বাধা দিতে সাহস করলো না কেউ। বাবার শেষ-কৃত্যের আগের দিন রাতে তো পেট পুরে মদ খেলো। কুৎসিত গানটাও গাইলো। নোংরামির চূড়ান্ত করে ছাড়লো একেবারে। শরীরের ওপর এই অত্যাচারে সাংঘাতিক রকম দুর্বল হয়ে পড়ছে সে ক্রমেই। আশংকা হলো, যে-কোনো সময় ঢলে পড়ে মরে যেতে পারে। এদিকে

ডাক্তারচাচাও নেই। দূরে কোথায় রোগী দেখতে গেছেন, বাবা মারা যাবার পর, এখনও ফেরেননি।

দুর্বল শরীর নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করে ক্যাপ্টেন। কখনও দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে সাগর দেখে, বাতাসে ভেসে আসা নোনা-পানির গন্ধ নেবার চেষ্টা করে জোরে জোরে শ্বাস টেনে। আমার সঙ্গে কথা বলাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। মেজাজ হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক রুক্ষ। মরে মরে অবস্থা, কিন্তু তবু হলঘরে বসে ছুরিটা খুলে টেবিলে রাখা তার বদঅভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। মানুষজনের যাতায়াত নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। চিন্তায় ডুবে থাকে।

বাবার শেষকৃত্যের পরের দিন। বিচ্ছিরি রকমের কুয়াশা পড়ছে। কনকনে ঠাণ্ডা। বেলা তিনটে নাগাদ কোনো কারণ ছাড়াই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাবার জন্যে মনটা কেমন করছে। এই সময়ই দেখলাম লোকটাকে। ধীর পায়ে এগোচ্ছে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। চলার ধরন দেখে অনুমান করলাম, সে অন্ধ। চোখ আর নাক সবুজ আচ্ছাদনে ঢাকা। সামনের দিকে কুঁজো হয়ে হাঁটছে। পরনে জাহাজীদের পুরোনো শতচ্ছিন্ন জোব্বা। বিকলাঙ্গও মনে হচ্ছে তাকে। তীব্র ঠাণ্ডায় কুয়াশার ভেতর দিয়ে হেঁটে আসা লোকটাকে এক আজব প্রাণী বলে মনে হলো আমার।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো লোকটা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যেন বাতাসকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'গড ব্লেস কিং জর্জ। অন্ধ মানুষ আমি। দেশের কাজে চোখ হারিয়েছি। কেউ যদি বলে দিত, কোথায় এসেছি!'

'এটা অ্যাডমিরাল বেনবো ইন্,' বললাম, 'ব্ল্যাক হিল কোভ জায়গার নাম।'

'বাচ্চা ছেলের কথা শুনলাম? হাতটা একটু ধরবে, বাবা?' হাত

বাড়িয়ে দিল সে।

ধরলাম। চমকে উঠলাম পরক্ষণেই। প্রচণ্ড জোরে আমার হাত চেপে ধরেছে আগন্তুক। ব্যথা লাগছে। হাত ছাড়িয়ে নেবার জোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ঝটকা মেরে আমাকে একেবারে গায়ের ওপর এনে ফেললো লোকটা। বললো, 'আমাকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চল্।'

'অ্যাঁ···আমি পারবো না···আমাকে মেরে ফেলবে···,'

'ওসব শুনতে চাই না!' চাপা গলায় ধমকে উঠলো অন্ধ, 'জলদি চল্! নইলে দিলাম কব্জি ভেঙে···,' প্রচণ্ড জোরে আমার কব্জি মুচড়ে দিল সে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলাম যন্ত্রণায়। অন্ধকে থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম, 'সব সময় ছুরি সঙ্গে রাখে ক্যাপ···ওহহ্···,'

'আমিও ছুরি রাখি,' কব্জির ওপর হাতের চাপ বাড়ালো আবার অন্ধ। 'ধানাই-পানাই বাদ দিয়ে চল্ জলদি!' ভয়ংকর কর্কশ হয়ে উঠেছে কণ্ঠস্বর। জীবনে শুনিনি এমনটি। সত্যিই ভয় পেলাম এবার। আর দ্বিরুক্তি না করে নিয়ে চললাম তাকে।

আমার শরীর ঘেঁষে, সাঁড়াশির মতো কঠিন আঙ্গুলে কব্জি চেপে ধরে পাশে পাশে চললো অন্ধ। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আমাকে হুঁশিয়ার করলো, 'কোনোরকম চালাকি নয়। যেখানে নিয়ে যেতে বলছি, সোজা সেখানে···'

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে ক্যাপ্টেন। দরজা খোলার শব্দেও চোখ তুললো না। ডেকে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, দেখুন কে এসেছে!'

'কে?' চোখ মেললো ক্যাপ্টেন। অন্ধের ওপর চোখ পড়তেই

স্থির হয়ে গেল ঘোলাটে দৃষ্টি। দ্বিধা, তারপর ভয়, সবশেষে আতংক ফুটলো নাবিকের চোখের তারায়। চকিতে যেন বয়েস আরও বেড়ে গেল তার। রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করেছে রোগশীর্ণ মুখে। ঢলে পড়ে যাবে যেন যে-কোনো সময়। 'এসে গেছো!' ফিসফিস করে বললো ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ,' আমার কব্জিতে আবার আঙ্গুলের চাপ বাড়ালো অন্ধ। বললো, 'এই ছোঁড়া, ওর পাশে নিয়ে যা আমাকে।'

ক্যাপ্টেনের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো অন্ধ। আমার কব্জি ছেড়ে দিল। একলাফে পিছিয়ে এলাম আমি। কব্জি ডলতে লাগলাম।

'তোমার ডান হাতটা, বিল,' আদেশ দিল অন্ধ।

অভিভূতের মতো হাত বাড়ালো ক্যাপ্টেন। কি একটা জিনিস গুঁজে দিল ক্যাপ্টেনের মুঠোয় অন্ধ। ধরলো সেটা নাবিক, কিন্তু দেখার প্রয়োজন বোধ করলো না।

জিনিসটা দিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো অন্ধ। লাঠিটা মাটিতে ঠুকে ঠুকে পথ চিনে নিয়ে নির্ভুলভাবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। সিঁড়িতে তার লাঠির শব্দ মিলিয়ে যেতেই ছুটে গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে।

এতক্ষণে মুঠো খুলে চাইলো ক্যাপ্টেন। এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা: 'দশটায়! আর মাত্র ছয় ঘণ্টা পরে!!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন। পরক্ষণেই হাত চলে গেল গলার কাছে। অদ্ভুত ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত নিজেকে খাড়া রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে। তারপর দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লো মেঝেতে।

চেঁচিয়ে মাকে ডাকলাম। ছুটে এল মা। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। করার আর কিছুই নেই।

লোকটাকে কোনো সময়েই ভাল লাগেনি আমার। কিন্তু আশ্চর্য! তার মৃত্যুতে অঝোর কান্না রোধ করতে পারলাম না কিছুতেই। কেন, নিজেও বুঝিনি সেদিন।

চার

জাহাজী-সিন্দুক।

অন্ধের নিয়ে আসা কাগজের টুকরোটা পড়লো মা। আমি আগেই পড়ে ফেলেছি। শংকিত হয়ে পড়লো মা। সাংঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে আসছে, মায়ের মতো আমিও বুঝতে পারছি। ক্যাপ্টেন নিজেই আমাকে বলেছে, তার কিছু জমানো টাকা আছে। থাকলে ওগুলো আছে ওই সিন্দুকেই। এটা নিশ্চয় অনুমান করে ফেলেছে দস্যুরা। সুতরাং ওরা আসবে। ব্ল্যাক ডগ আর অন্ধ দস্যুর মতো লোকেরা খামোকা সময় নষ্ট করতে আসেনি নিশ্চয়।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মোতাবেক এখন ডাক্তার লিভসীকে খবর দেয়া দরকার। এবং তাহলে আমাকেই যেতে হবে। কিন্তু মাকে একা রেখে যাই কি করে? ঘরের নিস্তব্ধতার মাঝে দেয়াল ঘড়িটার টিক টিক বড় বেশি করে কানে বাজছে। ফায়ার প্লেসে জ্বলন্ত গনগনে লাল কয়লা-গুলো যেন জলদস্যুর ভয়ংকর রক্তচক্ষু। আমাদের দিকে তাকিয়ে নিঃ-শব্দে হাসছে। ফিসফিস করে যেন কথা বলছে কারা আমাদের চার-পাশে। মেঝেতে পড়ে থাকা ক্যাপ্টেনকে যেন আবার জাগিয়ে তুলতে

চাইছে অজানা অশরীরীরা। শিউরে উঠলাম। একটা হিমেল স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

খুব দ্রুত কিছু করতে হবে আমাদের। বাইরে কুয়াশাঢাকা হিমেল সন্ধ্যা নামছে। আর দেরি করলে আগামী সকালে এসে আমাদের মৃতদেহ উদ্ধার করবে গ্রামবাসীরা।

মা আর আমি পরামর্শ করে গ্রামবাসীদের খবর দেয়াই ঠিক করলাম। ঘনায়মান সন্ধ্যার কুয়াশায় ঢাকা আকাশের নিচে নেমে এলাম আমরা। মাথায় টুপি পরতে পর্যন্ত ভুলে গেছি।

সরাই থেকে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে গ্রাম। অন্ধ ডাকাতটা এসেছিল উল্টোদিক থেকে। আশা করলাম, ওদিকেই আবার চলে গেছে সে। দ্রুত পা চালালাম। মা আর আমি, দু'জনে দু'জনকে আঁকড়ে ধরে আছি। যে-কোনোরকম অস্বাভাবিক শব্দের জন্যে খাড়া রয়েছে কান। কিন্তু পাহাড়ের পাথুরে পাদদেশে ঢেউ আছড়ে পড়ার মৃদু ছলাৎ-ছল শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

গ্রামে এসে পৌঁছুলাম। সন্ধ্যাবাতি জ্বালছে সবাই। দরজা-জানালার ফাঁকফোকড় দিয়ে বেরিয়ে আসা হলদে-লাল আলোর মৃদু রশ্মি প্রাণের সঞ্চার করলো যেন আমাদের দেহে।

গ্রামবাসীরা আমাদের কথা মন দিয়ে শুনলো। কিন্তু কেউই সরাইয়ে যেতে রাজি হলো না। জানের ভয় সবারই আছে। আসলে আমিই ভুল করেছি। ক্যাপ্টেনের মুখে শোনা ফ্লিন্টের নাম বোকার মতো বলে বসেছি গ্রামবাসীদের কাছে। আমি নামটা শুনেছি ক্যাপ্টেনের কাছে, কিন্তু গ্রামের কোনো কোনো প্রাচীন লোক আগেই শুনেছে ওই নাম। শোনামাত্রই আতংকিত হয়ে পড়েছে তারা। কেউ কেউ জানালো, দুপুরের দিকে কয়েকজন অচেনা লোককে পাহাড়ের ওদিকে

ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। দু'জন জেলে জানালো, 'কিটস হোল'-এ অচেনা একটা ছোট জাহাজ দেখেছে। ওদের মতে, দলবল নিয়ে এসে পড়েছে দুর্দান্ত জলদস্যু ফ্লিন্ট।

সরাইয়ে যেতে রাজি না হলেও ডাক্তার লিভসীর বাড়িতে যেতে রাজি হলো দু'একজন।

অনেক অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ-উপরোধ করেও কাউকে অ্যাডমিরাল বেনবোয় যেতে রাজি করাতে পারলো না মা। শেষে রেগেমেগেই বললো, 'তোমরা পুরুষ মানুষ বলে বড়াই করো আবার! ঠিক আছে, কেউ যেতে না চাও, না যাবে। আমি মেয়ে মানুষ, কিন্তু তবু যাবো। মরতে হলে বাধা দিয়ে, তবে মরবো। ডাকাতেরা সব লুটপাট করে নিয়ে গেলে ছেলেটাকে নিয়ে পথে বসতে হবে আমাকে। এতদিন ভাবতাম তোমরা আমার প্রতিবেশী, বিপদে-আপদে সাহায্য পাবো। কিন্তু ভুল। ভীতু কাপুরুষদের ওপর নির্ভর করার কোনো মানে হয় না। চল্, জিম,' আমার হাত ধরে টানলো মা, 'চল্ যাই।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো গ্রামবাসীরা। আমাদের এভাবে বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না ওদের, অথচ ভয়ে সঙ্গেও যেতে পারছে না। আমরা রওনা হতেই ডেকে থামালো একজন বুড়ো। গুলি-ভর্তি একটা পিস্তল দিল আত্মরক্ষার জন্যে। ঘোড়া দিয়েও সাহায্য করতে চাইলো, কিন্তু নিল না মা। একজন যুবক গেল ডাক্তার লিভসীকে খবর দিতে।

হিম-রাতের অন্ধকারে আবার পথে নেমে এলাম মায়ের সঙ্গে। কুয়াশা ভেদ করে একটা লালচে আভা দেখা যাচ্ছে দিগন্তে। চাঁদ উঠছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। চলার গতি দ্রুত করলো মা। শিগগিরই ধূসর আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে পথঘাট। কাছেপিঠে থেকে থাকলে

সহজেই আমাদের দেখে ফেলবে দস্যুরা।

পথের দুইধারে ঝোপঝাড়। গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে প্রতিটি ঝোপের ভেতর গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে বুঝি ডাকাতেরা। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ওপর চড়াও হতে পারে। সরাইখানার সদর দরজাটা চোখে পড়তেই অনেকখানি সাহস ফিরে পেলাম।

ঘরে ঢুকেই দরজার ছিটকিনি তুলে দিল মা। দ্রুত হেঁটে এসেছি। কনকনে ঠাণ্ডায়ও ঘেমে নেয়ে উঠেছে আমাদের শরীর। হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক। দরজার কাছেই, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দম নিলাম আমরা। তারপর গিয়ে খুঁজেপেতে মোমবাতি বার করলো মা। জ্বাললো। একটি মাত্র মোমের আলোয় ঘরের অন্ধকার দূর তো হলোই না, চারপাশ থেকে আরও যেন চেপে ধরলো। দেয়ালে কাঁপছে ধূসর ছায়া। হাত ধরাধরি করে নাচছে যেন অসংখ্য দস্যু।

হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলো মা। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ফিসফিস করে বললো, 'চল্, আগে ক্যাপ্টেনের ঘরে যাই। তার সিন্দুকটা খুলে দেখতে হবে।' মাকে সাহসী বলেই জানতাম, কিন্তু এতটা সাহসী বুঝিনি।

দুরুদুরু বুকে গিয়ে ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। ঠেলা দিয়ে পাল্লা খুললো মা। মেঝেতে তেমনি পড়ে আছে ক্যাপ্টেন। ভেতরে ঢুকেই বললো মা, 'জিম, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে দে। কে জানে আমাদের ওপর ওরা নজর রাখছে কিনা!'

শেষ জানালাটা বন্ধ করে সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, এমনি সময় ঢং ঢং করে উঠলো ঘড়ি। চমকে চোখ তুলে চাইলাম। ছ'টা বাজে। ফিসফিস করে বললাম, 'আর মাত্র চার ঘণ্টা সময় আছে, মা!'

সঙ্গে আনা মোমের আগুনে ঘরের লণ্ঠন বাতি ধরিয়ে ফেলেছে মা

ইতিমধ্যেই। আমাকে বললো, 'চাবিটা বার কর। ক্যাপ্টেনের পকেটেই আছে হয়তো।'

অন্য সময় হলে কি করতাম জানি না, কিন্তু সেই সন্ধ্যায় নির্দ্বিধায় এগিয়ে গিয়ে লাশের পাশে বসে পড়লাম আমি। ক্যাপ্টেনের কোটের পকেটে হাত ঢোকালাম। সবক'টা পকেট হাতড়ে একে একে বের করে আনলাম কিছু খুচরো পয়সা, একটা আঙটি, সুতোর বাণ্ডিল, বড় সুঁচ, এক টুকরো তামার তার, একটা ছোট কম্পাস, আর একবাক্স দেশলাই। কিন্তু কোনো চাবি নেই।

কি যেন ভাবলো মা। তারপর বললো, 'ওর গলার কাছে দেখতো।'

আছে। মা কি করে অনুমান করলো জানি না, তবে আছে চাবিটা। গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানো, লকেটের মতো করে। সুতো ছিঁড়ে চাবিটা খুলে নিলাম। এগিয়ে গেলাম সিন্দুকের দিকে। কতদিন কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছি এই সিন্দুকটার দিকে। আজ দেখতে পাবো কি আছে ভেতরে।

আমার পাশে এসে দাঁড়ালো মা। হাত বাড়ালো। 'চাবিটা আমার কাছে দে।'

তালাটায় তেল দেয়া আছে। চাবি ঢুকিয়ে একবার মোচড় দিতেই খুলে গেল। আস্তে করে ডালাটা তুলে উঁচু করে ধরলো মা।

পুরোনো তামাক আর আলকাতরার তীব্র গন্ধ সিন্দুকের ভেতর। উপরের দিকে কিছু কাপড় চোপড় ভাঁজ করে রাখা। দামী জিনিস, অব্যবহৃত। কাপড়গুলো বের করে আনলো মা। নিচে নানারকম জিনিস: একটা কোয়াড্র্যান্ট, একটা টিনের প্যানিকিন, তামাক, পিস্তলের চমৎকার দু'টো খাপ, একটা রূপার বাঁট, পুরোনো একটা স্প্যানিশ ঘড়ি, দু'টো কম্পাস, গোটা পাঁচেক সুদৃশ্য ঝিনুকের খোলা এবং আরও

কিছু টুকিটাকি জিনিস। অবাক হলাম। এসব সাধারণ জিনিসই তার কাছে এত মূল্যবান ছিল!

আরও নিচে পাওয়া গেল নৌকার পালের খানিকটা। নোনাপানির দাগ জায়গায় জায়গায়। বিরক্ত হয়ে টান মেরে কাপড়টা তুলে ফেলে দিল মা। বেরিয়ে পড়লো আসল জিনিস।

অয়েলক্লথে মোড়া একটা প্যাকেট। আর একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। ব্যাগটা নাড়াতেই ভেতরে ধাতব শব্দ উঠলো। সেই প্রথম দিনে মেঝেতে ছুঁড়ে দেয়া মোহরের আওয়াজ কেমন, মনে আছে। ব্যাগের ভেতরের শব্দ তাই অচেনা লাগলো না।

আমার মুখের দিকে তাকালো মা। 'ইচ্ছে করলে সবই নিতে পারি আমরা। কিন্তু চোর তো নই। তাই ক্যাপ্টেনের কাছে আমাদের যা পাওনা হয়েছে, তার বেশি একটা মুদ্রাও নেবো না। যাতো বাবা, একটা কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে আয়।'

ব্যাগ খুলে মোহর বার করলো মা। গুণে গুণে আমার হাতে দিতে লাগলো। ব্যাপারটা এত সহজ নয়, বেশ সময়সাপেক্ষ। কারণ, মোহর-গুলো বিভিন্ন দেশের। সঠিক মূল্য নির্ণয় করাটা কঠিন কাজ।

অর্ধেক কাজ এগিয়েছে, হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠলাম। চেপে ধরলাম মা'র হাত। কুয়াশাঢাকা রাতের স্তব্ধ বাতাসে ক্ষীণ আওয়াজ-টাও ঠিকই এসে কানে পৌঁছেছে আমার। তুষার-ঢাকা রাস্তায় লাঠির ঠকঠক আওয়াজ। এগিয়ে আসছে ক্রমেই। মা-ও শুনতে পেয়েছে শব্দটা। স্তব্ধ হয়ে রইলাম দু'জনেই।

সরাইয়ের দরজায় লাঠি ঠোকার আওয়াজ হলো। ঘনঘন ধাক্কা দেয়া হলো দরজায়। কিন্তু ছিটকিনি তোলা থাকায় দরজা খুলতে পারলো না। খিস্তির আওয়াজ কানে এল। তারপর আবার ঠকঠক

শব্দ। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দটা। শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেল একেবারে।

'মা,' বললাম। 'এভাবে গুণে নিতে গেলে হয়তো আর যাওয়াই হবে না আমাদের। চলো সব নিয়ে যাই।' বেশ বুঝতে পারছি, একা এসেছিল অন্ধ। দরজা খুলতে ব্যর্থ হয়ে চলে গেছে। কিন্তু ফিরে আসবে শিগগিরই। দলবল নিয়ে দরজা ভাঙার জন্যে তৈরি হয়ে।

কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না মা। তার পাওনা থেকে এক পয়সা বেশি নেবে না। বললো, সাতটা বাজেনি এখনও। সুতরাং সময় আছে হাতে। আবার গুণতে শুরু করলো।

মৃদু শিসের শব্দ কানে এল এই সময়। পাহাড়ের ওদিক থেকেই যেন এল শব্দটা।

'আমারও কাজ শেষ,' কান পেতে শিসের শব্দটা শুনে বললো মা।

'চারপেনি করে আমারও কিছু পাওনা হয়েছে ক্যাপ্টেনের কাছে,' অয়েলক্লথে মোড়ানো ছোট প্যাকেটটা তুলে নিতে নিতে বললাম। 'কাজেই আমি এটা নিচ্ছি।' কি ভেবে নিষেধ করলো না মা।

সঙ্গে করে আনা মোমটা শেষ হয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে অনুমানে অন্ধকারেই চললাম আমরা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে। সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম কয়েক সেকেণ্ড। সন্দেহজনক যে কোনো শব্দের জন্যে কান খাড়া রাখলাম। নিঃশব্দে ছিটকিনি খুললো মা। বাইরে বেরিয়ে এলাম আবার আমরা।

চাঁদ উঠে পড়েছে। দ্রুত সরে যাচ্ছে কুয়াশা। ইতিমধ্যেই অনেকখানি হালকা হয়ে এসেছে। হলদে-ধূসর জ্যোৎস্নায় নাওয়া পথঘাট। তুষারঢাকা পাথরের পাহাড়টা বেয়ে যেন তরল সোনার বান নেমেছে।

অপরূপ এই রূপ উপভোগ করার মতো সময় কিংবা মানসিক অবস্থা, কোনোটাই এখন নেই আমাদের। পিচ্ছিল পথ ধরে দ্রুত ছুটছি। গ্রাম আর সরাইয়ের মাঝের অর্ধেক পথ পেরিয়েছি, এমনি সময় কানে এল বুট পরা পায়ের শব্দ। কয়েক জোড়া। পেছনে ফিরে তাকালাম। ছোট্ট একটা আলো দুলছে। লণ্ঠন নিশ্চয়।

হাঁপিয়ে উঠেছে মা, আর পারছে না। আমার দিকে মোহরের থলেটা বাড়িয়ে ধরে বললো, 'তুই পালা, বাবা! আমি আর পারছি না!'

সাংঘাতিক রাগ হলো গ্রামবাসীদের ওপর। জীবিত থাকতে ওদের কম সাহায্য করেনি বাবা। অথচ এই বিপদে আমাদের দিকে একটু সাহায্যের হাত বাড়ালো না ওরা! মাকেও দোষী সাব্যস্ত করলাম মনে মনে। এত দুঃসাহসের কি প্রয়োজন ছিল? আর সাহস করে সরাইয়ে যখন গিয়েছেই, টাকা-পয়সা আর মুদ্রাগুলো নিয়ে ঝটপট কেটে পড়লেই হয়ে যেত। এত সততা দেখাতে গেল কেন?

মা আর হাঁটতে পারছে না। কিন্তু তাকে ফেলে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দরকার হলে আমিও মরবো, কিন্তু মাকে রেখে যেতে পারবো না কিছুতেই। একহাতে থলেটা ধরে অন্য হাতে মার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। ভর রাখতে বললাম আমার কাঁধে। তারপর কোনোরকমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে পৌঁছলাম ছোট ব্রিজটার কাছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমিও। সেই বিকেল থেকে কম পরিশ্রম তো করিনি। তারওপর প্রচণ্ড উত্তেজনা। ঠাণ্ডা তো আছেই।

তুষারের ওপরই বসে পড়লো মা।

পাঁচ

অন্ধের পরিণতি

লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। মাকে নিয়ে নেমে ব্রিজের তলায় বসিয়ে রেখে এসেছি। কৌতূহল দমন করতে না পেরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে চলে এসেছি সরাইয়ের কাছে। গা-ঢাকা দিয়ে বসেছি একটা ঝোপের ভেতরে। মুখটা বের করে রেখেছি শুধু। সরাইয়ের দরজাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটাও দেখতে পাচ্ছি। সাত আটজন লোক দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে সরাইয়ের দিকে। একটা লোককে দু'দিক থেকে ধরে নিয়ে এগোচ্ছে দু'জন লোক। মাঝের লোকটা অন্ধ দস্যু।

দরজার কাছে এসেই আদেশ দিল অন্ধ, তার কণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পেলাম। রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিল কর্কশ কণ্ঠ, 'ভেঙ্গে ফেল্ দরজা!'

তিনজন লোক এগিয়ে গেল। হাত রাখতেই খুলে গেল ভেজানো পাল্লা। কথা শুনেই বোঝা গেল, বিস্মিত হয়েছে ওরা।

'জলদি, জলদি ঢোক ভেতরে!' গর্জে উঠলো অন্ধ। 'হারামজাদা বিল পালিয়েছে হয় তো!'

দু'জন সহকারীর সঙ্গে বাইরে রয়ে গেল অন্ধ। অন্যেরা সবাই ভেতরে ঢুকে পড়লো। কিছুক্ষণ নীরবতা। হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল বাড়ির ভেতর থেকে, 'বিল মরে গেছে!'

গাল দিয়ে উঠলো অন্ধ। 'মরেছে, কাজ কমেছে হাঁদারামের দল! ওর শরীর তল্লাশি কর্! সিন্দুকটা বের করে নিয়ে আয়। জলদি!' তর সইছে না আর ডাকাতটার।

প্রচণ্ড হাঁকডাক শুরু করেছে ডাকাতেরা। বাড়ির ভেতরে জিনিস-পত্র ছেঁচড়ানো আর ভাঙার আওয়াজ উঠছে। দাপাদাপি শোনা যাচ্ছে সিঁড়িতে। এক ঝটকায় খুলে ফেললো কেউ ক্যাপ্টেনের ঘরের জানা-লার একটা পাল্লা। শার্শির কাচ ভাঙলো ঝনঝন শব্দে। খোলা জানা-লায় একটা লোকের কাঁধ-মাথা দেখা গেল। অন্ধকে ডেকে বললো সে, 'পিউ, সিন্দুকটা খোলা। তছনছ হয়ে আছে ভেতরের জিনিসপত্র।'

'ওটা আছে কিনা দেখ্, গাধা কোথাকার!' রাগে ফুঁসছে অন্ধ।

'মোহরগুলো আছে।'

'টাকার কথা বলছি না, শুয়োর কোথাকার! নক্সাটা আছে কিনা দেখ!'

আধ মিনিট নীরবতার পর আবার জবাব দিল লোকটা, 'না নেই।'

'দেখ, বিলের শরীরে কোথাও আছে কিনা!'

'আবার নীরবতা। তারপর আবার জবাব এল, 'নেই।'

'হুঁহ্! বুঝতে পেরেছি, ওই হারামজাদা ছেলেটার কাজ। ইস্স্, কেন যে চোখ দু'টো তখন গেলে দিইনি!' চেঁচিয়ে বললো পিউ, 'একটু আগে যখন এসেছিলাম, দরজা বন্ধ ছিল। দেখ্ কোথায় ব্যাটা। খোঁজ খোঁজ, খুঁজে বের কর!'

তুমুল কাণ্ড শুরু হলো সরাইয়ের ভেতরে। বুটপরা ভারি পায়ের ধুপধাপ, আসবাবপত্র ছুঁড়ে ফেলার শব্দ, দরজায় লাথি মারার আওয়াজ উঠছে। কয়েক মিনিট চললো এই অবস্থা। তারপর একজন লোক উঁকি দিল সরাইয়ের দরজায়। পিউকে জানালো, আমাদের খুঁজে

পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ এই সময় হুঁইসেলের তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। গ্রামের ওদিক থেকে এসেছে শব্দটা।

'পুলিশ!' চেঁচিয়ে উঠলো অন্ধের পাশে দাঁড়ানো একজন। 'এই তোরা সব বেরিয়ে আয়···ডার্ক, কোথায় তোরা? পুলিশ আসছে!'

'পালাবি কেন, ভীতুর ডিম কোথাকার!' ধমকে উঠলো পিউ। আফসোস করলো, 'ইস্‌স্‌, আজ যদি আমার চোখ থাকতো!'

সরাইয়ের ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ডাকাতেরা। সরাইয়ের আশপাশের ঝোপঝাড়ে আমাদের খোঁজার নির্দেশ দিল অন্ধ। পুলিশ আসছে তাই দ্বিধা করলো দস্যুরা। আবার ভীতু, কাপুরুষ বলে গাল দিল অন্ধ।

'লক্ষ-কোটি টাকা তোদের হাতের নাগালে,' বোঝানোর চেষ্টা করছে পিউ, 'এই সুযোগ ছেড়ে দিবি? দেখ দেখ, জলদি খুঁজে দেখ ছোঁড়াটা কোথায়। নক্সাটা বের করতেই হবে।'

'নক্সা-ফক্সার দরকার নেই, পিউ,' বললো এক ডাকাত। 'মোহর-গুলো পেয়েছি, এতেই চলবে।'

'খামোকা চিল্লাচিল্লি করে লাভ নেই,' প্রথমজনের সমর্থনে বললো আরেক ডাকাত। 'চল কেটে পড়ি।'

ভয়ংকর ক্ষেপে গেল অন্ধ। চেঁচিয়ে গাল দিতে শুরু করলো। কিন্তু এতেও কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে এলোপাতাড়ি বাড়ি মারতে লাগলো লাঠি ঘুরিয়ে। দপাদপ কয়েক ঘা খেলো লাঠির আওতায় দাঁড়ানো ডাকাতেরা। ভয়ংকর দাঁত খিঁচিয়ে পিউকে গালাগাল দিয়ে উঠলো ওরা। সরে গেল লাঠির আওতার বাইরে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল এই সময়। গ্রামের ওদিকে পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে আসছে একাধিক ঘোড়া। পিস্তলের আও-

আজ চলো সরাইয়ের পেছনের পাহাড়ে। মনে হলো, আলোর ঝলকও দেখতে পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে শুরু করলো ডাকাতেরা কিটস ছোলের দিকে। বুঝলাম, পিস্তলের শব্দ করে কেউ ওদের পালাবার ইঙ্গিত করেছে।

অন্ধকে ফেলে রেখেই পালিয়েছে ডাকাতেরা। এইবার নিজের বিপদ বুঝতে পারলো পিউ। লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ খুঁজে নিয়ে ছোটার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু পারছে না। বার বার হোঁচট খাচ্ছে। আতংকিত হয়ে পড়লো সে। দাঁড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় চেঁচিয়ে ডাকলো, 'ওরে ভাইয়েরা, আমাকে ফেলে যাসনে! আমাকে নিয়ে যা, ভাই, নিয়ে যা...'

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। আবার ছুটতে শুরু করলো পিউ। ভুল করে গ্রামের পথে ছুটছে।

ঠিক এই মুহূর্তে উল্টো দিকের পাহাড়ের ওদিক থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন অশ্বারোহী। চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছি ওদের। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে দ্রুত।

ছুটছে পিউ। হঠাৎ তুষারে পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়লো রাস্তার ওপর। অশ্বারোহীরাও এসে পড়েছে। পথের ওপর পড়ে যাওয়া মানুষটাকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলো সামনের ঘোড়সওয়ার। আকাশ ফাটানো আর্তনাদ করে উঠলো অন্ধ। তাকে মাড়িয়ে চলে গেল সবক'টা ঘোড়া। চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম, নড়ছে পিউয়ের দেহটা। কাত হলো, তারপর চিৎ হয়ে গেল আস্তে আস্তে। আর নড়লো না।

অশ্বারোহীরা আরও কাছে এসে যেতেই লাফিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। সামনের আরোহী একজন অফিসার, মিস্টার ডানস কিটস। গ্রাম থেকে যে যুবকটা গিয়েছিল ডাক্তার লিভসীকে খবর দিতে,

সে-ও আছে সঙ্গে। পাহাড়ের ওদিকে সাগরে সন্দেহজনক জাহাজের কথা দুপুরেই কানে গিয়েছে কিটসের। তদন্ত করতে আসছিলেন। পথে গ্রামের যুবকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

পিউ মরে গেছে। চোখের সামনের সবুজ আচ্ছাদন খসে পড়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে আছে যেন কালো কোটর দু'টো। বীভৎস।

আমাকে দেখে থামলেন ডানস কিটস। যুবকটাও থামলো। দু'এক কথা জিজ্ঞেস করে, একজন পুলিশকে আমার কাছে রেখে দলবল নিয়ে ডাকাতরা যেদিকে গেছে, সেদিকে ধাওয়া করলেন কিটস। পরে ফিরে এসে তিনি জানিয়েছেন, ছোট পালতোলা জাহাজটা নিয়ে পালিয়েছে ডাকাতেরা। ধরতে পারেননি কাউকে।

পুলিশ এবং যুবকের সহযোগিতায় মাকে নিয়ে এলাম সরাইখানায়। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল ব্রিজের তলায়। খানিকটা রাম ঢেলে দিলাম তার মুখে। গরম সেঁক ইত্যাদি দিয়ে গা গরম করে জ্ঞান ফেরানো হলো।

মার জ্ঞান ফিরলে আমি ঘরদোরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। চাওয়া যায় না। ডাকাতেরা জিনিসপত্র কিছুই আর আস্ত রাখেনি। ভেঙেচুরে একেবারে তছনছ করে দিয়ে গেছে সবকিছু। দেয়ালের ঘড়িগুলো পর্যন্ত খুলে নিয়ে আছড়ে ভেঙেছে।

ইতিমধ্যে কিটসও ফিরে এসেছেন। তাঁর আর উপস্থিত অন্যান্য লোকদের সব খুলে বললাম—বিকেলে অন্ধ পিউয়ের প্রথম সরাইয়ে আগমন থেকে ডাকাতেরা পালানো পর্যন্ত সব কথা।

কিটস বললেন, 'কিন্তু মোহরগুলো তো পেয়ে গিয়েছে, আর কিসের খোঁজ করছিল ওরা?'

হঠাৎই প্যাকেটটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। জামার ভেতরের পকেটে রেখেছি। ওটা বের করে এনে বললাম, 'হয় তো এটার

খোঁজ করছিল। অন্ধকে বার বার ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের নক্সার কথা বলতে শুনেছি।'

'দেখি?' হাত বাড়ালেন মিস্টার ডানস।

'আমি ভাবছিলাম মিস্টার লিভসীর কাছে জমা দেবো এটা...'

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বললেন কিটস, 'ওঁকেই দিও। উনিই আগে খুলে দেখবেন, কি আছে ভেতরে।' কি যেন ভাবলেন ডানস, 'তাহলে চলো যাই, ডাক্তার সাহেবের ওখানে। দেরি না করে আজই জমা দিয়ে দেয়া উচিত। নিশ্চয় মূল্যবান কিছু আছে প্যাকেটে, নইলে ওটার জন্যে এমন পাগল হয়ে উঠতো না অন্ধ।'

কিটসকে ধন্যবাদ দিলাম।

ডগার নামে একজন লোককে নির্দেশ দিলেন কিটস, 'ডগার, তোমার ঘোড়াটা ভাল। ছেলেটাকে তোমার সঙ্গেই নাও।'

মায়ের কাছে একজন লোককে রেখে সে-রাতেই ডাক্তার লিভসীর বাড়ির পথে রওনা দলা ম আমরা।

ছয়

মানচিত্র

বাড়িতে পাওয়া গেল না ডাক্তার লিভসীকে। চাকরানী জানালো, বিকেলে বেরিয়ে গেছেন ডাক্তার। হল-এ গেছেন। রাতের খাওয়াটা জমিদার বন্ধু ট্রেলনীর ওখানেই সারবেন।

'সেখানেই যাবো,' বললেন ডানস।

রাস্তা বেশি না। চাঁদের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলেছি আমরা। পথের দু'পাশে সারি সারি গাছ, পাতা ঝরে গেছে। চাঁদের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে নিষ্প্রাণ গাছগুলোকে। সবকিছুতেই যেন জলদস্যুর ছোঁয়া লেগে আছে।

এক বিরাট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন ডানস। হাত তুলে পেছনের সবাইকে থামার ইঙ্গিত করলেন। তারপর নামলেন ঘোড়া থেকে। আমরাও নামলাম সবাই।

বেল টিপে ডাকতেই দরজা খুলে দিল বেয়ারা। পথ দেখিয়ে ট্রেলনীর লাইব্রেরীতে নিয়ে গেল আমাদের। ঘরে ঘরে সারি সারি আলমারি, সবগুলোতে বই ঠাসা। প্রতিটি আলমারির ওপরে রাখা আছে বিখ্যাত সব লোকের একটি করে আবক্ষ মূর্তি। ফায়ার প্লেসের পাশে বসে আছেন ডাক্তার লিভসী আর স্কয়ার ট্রেলনী। দু'জনেরই হাতে পাইপ।

এত কাছে থেকে এর আগে কখনও ট্রেলনীকে দেখিনি আমি। অনুমান করলাম, ছ'ফুটের বেশি হবে উচ্চতা, সেই অনুপাতে স্বাস্থ্য। চেহারায় সপ্রতিভ ভাব, কিন্তু চামড়া রুক্ষ। কপালে বয়েসের বলিরেখা। কুচকুচে কালো ভুরু দেখলেই মেজাজের আঁচ পাওয়া যায়, তবে বদমেজাজী নয়। চোখের তারায় আবেগ আর উত্তেজনার মিশ্রণ। শুনেছি, দুর্গম অঞ্চলে ঘোরার সাংঘাতিক বাতিক আছে এই জমিদারের।

'আরে ডানস যে!' খুশি খুশি গলায় আপ্যায়ন করলেন ট্রেলনী, 'এসো, এসো। তারপর, কি মনে করে?'

আমাকে দেখে বিস্মিত হলেন ডাক্তার লিভসী। 'জিম, তুমি এত

রাতে। ব্যাপার কি?'

অল্প কথায় সব গুছিয়ে বললেন ডানস কিটস। শুনতে শুনতে ট্রেলনী, ডাক্তারচাচা, দু'জনেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ট্রেলনী তো চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চুল খামচাতে লাগলেন। খুলে এল তাঁর মাথার পরচুলাটা। বেরিয়ে পড়লো ছোট করে ছাঁটা চুল। চেহারাটাই পাল্টে গেল নিমেষে।

কিটসের কথা শেষ হতেই বলে উঠলেন ট্রেলনী, 'কানা বদমাশ-টাকে মেরে একটা দারুণ কাজ করেছো তুমি, কিটস!'

হাত বাড়ালেন ডাক্তারচাচা, 'প্যাকেটটা দাও, জিম।'

এগিয়ে গিয়ে প্যাকেটটা তুলে দিলাম তাঁর হাতে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ডাক্তারচাচা। ভেবেছি, দেয়া মাত্র খুলে দেখবেন ভেতরে কি আছে, কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিলেন তিনি। জমিদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ট্রেলনী, খাওয়াটা সেরে নেয়া যাক। ডানসের আবার ডিউটি আছে, তাকে আটকে রাখা ঠিক হবে না।' আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'আর এই ছেলেটারও নিশ্চয় পেট জ্বলছে...'

'আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাওয়ার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম,' ঘন্টা বাজিয়ে ভৃত্যকে ডাকলেন জমিদার।

সবার জন্যেই খাবার এল। আস্ত একটা পায়রার মাংস এল আমার জন্যে। দারুণ খিদে পেয়েছে, গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম।

খাওয়া শেষ হলো। বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ডানস কিটস। ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে আবার আরাম করে বসলেন ডাক্তারচাচা। পাশে গিয়ে বসলেন ট্রেলনী। আমিও গিয়ে বসলাম তাঁদের পাশে।

'প্যাকেটটা খুলে দেখা যাক এবার,' বললেন ট্রেলনী।

মৃদু হাসলেন ডাক্তারচাচা। 'অত অধৈর্য হচ্ছো কেন? তা আগে বলো তো, ফ্লিন্ট সম্পর্কে কি জানো।'

'ফ্লিন্ট?' গম্ভীর হয়ে গেলেন ট্রেলনী, 'আমি যার নাম শুনেছি সে একজন দুর্দান্ত জলদস্যু। ভয়ঙ্কর খুনী। ওর তুলনায় ব্ল্যাক বিয়ার্ডও নিতান্তই শিশু। স্পেনীয় সাগরে তো নাবিকেরা ওর নাম শুনলেই মূর্ছা যায়। আমি কিন্তু মনে মনে গর্বই অনুভব করেছি ফ্লিন্টের জন্যে।' ইংরেজ তো। ওকে দেখিনি কখনও, কিন্তু ত্রিনিদাদে ওর জাহাজ দেখেছি, তা-ও দূর থেকে।—আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল, একটা কাপুরুষ। ফ্লিন্টের জাহাজের ফ্ল্যাগ দেখেই সোজা ছুটলো, জাহাজ ভেড়ালো নিয়ে পোর্ট অফ স্পেনে।'

'আমিও শুনেছি তার নাম,' বললেন ডাক্তারচাচা। 'আচ্ছা, তার কি খুব টাকাকড়ি ছিল?'

'তো সারা জীবন ডাকাতি করেছে কেন? কিসের জন্যে অত জাহাজকে তাড়া করে বেড়িয়েছে? এত খুনখারাবিই বা কিসের জন্যে?' উত্তেজিত মনে হচ্ছে জমিদারকে।

'তোমার সঙ্গে কথা বলাই এক ঝকমারী! সারাক্ষণ মাথাটা গরম! আরে বাবা, ডাকাতি করে তো ডাকাতরা পয়সার জন্যেই, সে-কি জানি না? আসলে আমি জানতে চাইছি, জমানো টাকা-পয়সা, ধনরত্ন কেমন ছিল ফ্লিন্টের?'

'প্রচুর!' ঘোষণা করলেন জমিদার। দু'হাত ছড়িয়ে বললেন, 'এই এত্তো...'

'কে জানে এতে ফ্লিন্টের জমানো রত্নের সন্ধানই আছে কিনা!' পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করে সাইড টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন ডাক্তারচাচা। তাঁর পায়ের কাছেই রাখা ডাক্তারী-ব্যাগটা।

সেটা খুলে একটা কাঁচি বার করলেন, 'দেখি খুলে!'

কাপড়ের প্যাকেটের ভেতর থেকে দু'টো জিনিস বের হলো: একটা ডায়েরী, আর সিল-করা একটা খাম।

'এটাই পড়ি আগে,' ডায়েরীটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন ডাক্তারচাচা। পাতা ওল্টালেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ডাক্তারচাচার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় কতকগুলো হিজিবিজি আঁক আর কিছু অদ্ভুত শব্দ—ক্যাপ্টেনের হাতে উল্কিতে যেমন লেখা ছিল: 'বিলি বোনস হিজ ফ্যান্সী, মিস্টার ডব্লিউ বোনস, মেট,' 'নো মোর রাম,' 'অফ পাম কী হি গট ইট' ইত্যাদি। এছাড়াও আরও কিছু ছোট-খাটো শব্দ আছে, যেগুলোর অর্থ উদ্ধার করা রীতিমত কঠিন। একটা শব্দে—পিঠে ছুরির আঘাত জাতীয় কি যেন বোঝাচ্ছে!

'তেমন কিছু নেই,' পাতা উল্টে গেলেন ডাক্তারচাচা।

পরের দশ-বারোটা পাতা অদ্ভুত লেখায় ভরা। এক পাতায় একটা লাইনের প্রান্তে একটা তারিখ রয়েছে, অন্যপ্রান্তে টাকার অংক—সাধারণ হিসেবের খাতায় যেমন থাকে। তারিখটা ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুন, টাকা ৭০ পাউণ্ড—কার কাছে যেন পাওনা। নিচে লেখা: কারাক্কাস থেকে সামান্য দুরে। একটা অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমাও দেয়া আছে—৬১° ১৭' ২০" ৯° ২' ৪০"।

এরপরের কয়েকটা পৃষ্ঠায় শুধুই টাকার হিসেব। ক্রমেই বেড়েছে যোগফল। শেষ যোগফলটার তলায় লেখা: বোনস, তার সঞ্চয়।

'মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না,' বললেন ডাক্তারচাচা।

'কিন্তু না বোঝার কিছু তো নেই,' বললেন ট্রেলনী, কিছু জাহাজের নাম আছে, এগুলো ডুবিয়েছে দস্যুরা। টাকার অংকগুলো "বোনস"-এর বখরার হিসেব। "কারাক্কাস থেকে সামান্য দুরে" নিশ্চয় কোনো

জাহাজ আক্রমণ করেছিল ওরা। ঈশ্বর নাবিকদের আত্মাকে শান্তি দিন...'

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিলেন ডাক্তারচাচা। 'দেখেছেন, টাকার অংক ক্রমেই বেড়েছে!'

এর পরের একটা ছাড়া ডায়রীর বাকি পাতাগুলো সাদা। ওই একটা পাতায় একটা তালিকা—ফরাসী, ইংরেজী আর স্পেনীয় মুদ্রার পারস্পরিক মূল্যায়ন করা আছে।

'দারুণ হিসেবি ছিল তো বোনস,' মন্তব্য করলেন ডাক্তারচাচা, 'ঠকেনি নিশ্চয় কখনও।' ডায়েরীটা আবার পকেটে রেখে দিলেন তিনি।

'খামটা খোলো এবার,' বললেন জমিদার।

সিলমোহর করা খামের ভেতর থেকে বেরোলো একটা দ্বীপের মানচিত্র। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, পাহাড়, খাঁড়ি, উপসাগর ইত্যাদি পরিষ্কার দেখানো আছে। ন'মাইল দৈর্ঘ্য আর পাঁচ মাইল প্রস্থের মোটাসোটা ড্রাগন-আকৃতির এই দ্বীপ। সাগর থেকে উঠে গিয়ে দ্বীপে মিশেছে একটা পাহাড়—দু'পাশে দু'টো চমৎকার নেচারাল পোর্ট। পাহাড়টার নাম দেখা যাচ্ছে ম্যাপে 'দি স্পাই-গ্লাস'। ম্যাপের তিন জায়গায় লাল কালিতে 'ক্রস' চিহ্ন দেয়া আছে। দু'টো চিহ্ন দ্বীপের উত্তর অংশে, তৃতীয়টা রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। এই চিহ্নটার নিচে কালো কালিতে ছোট কিন্তু পরিষ্কার অক্ষরে লেখা: ধনরত্নের স্তূপ এখানে। লেখাটা ক্যাপ্টেন বোনসের হাতের নয়।

ম্যাপের উল্টো পিঠে একই হাতের লেখা আছে: 'টল ট্রি, স্পাই-গ্লাস শোল্ডার, উত্তরে উত্তর-পূর্বের উত্তরে এক জায়গায়। স্কেলিটন আইল্যাণ্ড পূর্বে দক্ষিণ-পূর্বের পূর্বে। দশ ফুট। রূপার বাঁট উত্তরের

গুপ্তস্থানে। পূর্বের ঢিবি ধরে এগিয়ে দক্ষিণে ষাট ফুট গেলে সামনে পড়বে। বালি পাহাড়ে, বাহু দু'টো সহজেই পাওয়া যাবে, উত্তর বিন্দুতে উত্তর অন্তরীপের প্রবেশ পথে···

—জে. এফ. ”

'হুঁম্‌ম্‌!' উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন জমিদার, 'এটা জন ফ্লিন্টের গুপ্তধনের ঠিকানা, ঠিকই অনুমান করেছি।' ডাক্তারচাচার দিকে ফিরে বললেন, 'ডাক্তার, আগামীকালই ব্রিস্টল রওনা হচ্ছি আমি। দিন দশেকের মধ্যেই সেরা জাহাজ আর সেরা নাবিক যোগাড় করে ফেলতে পারবো। আমি খবর পাঠালেই আপনি আর জিম চলে যাবেন ব্রিস্টলে। তারপর বেরিয়ে পড়বো আমরা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে। আপনি জাহাজের ডাক্তারের কাজ চালাবেন, জিম কেবিন-বয় আর আমি হবো অ্যাডমিরাল। আর হ্যাঁ, রেডরুথ, হাণ্টার, জয়েসকেও সঙ্গে নেবো। অনুকূল বাতাস পেলে···ঠিকানাতো জানাই আছে, দ্বীপে পৌঁছতে বেশিদিন লাগবে না। তারপর···তারপর বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে···'

'কাটানো যাবে, এই তো?' বললেন ডাক্তারচাচা, 'কিন্তু···'

'আবার কিন্তু কিসের?' ভুরু কোঁচকালেন জমিদার।

'জলদস্যুদের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? এই নক্সার জন্যেই আজ বেনবো সরাইয়ে আক্রমণ চালিয়েছে ওরা। নিশ্চয় তক্কে তক্কে থাকবে ···ব্রিস্টল থেকে আমাদের জাহাজ নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরোতে দেখলেই বুঝে নেবে সব। ভাববেন না আমরা ওদের চোখের আড়াল হতে পারবো। দূরে, সাগরেই আমাদের খুন করবে ওরা। জাহাজশুদ্ধ ডুবিয়ে দেবে। তার আগে অবশ্যই নক্সাটা ছিনিয়ে নেবে আমাদের কাছ থেকে···'

'তারমানে, এই মুহূর্ত থেকে মুখে কুলুপ এঁটে ফেলতে হবে আমাদের। নক্সা সম্পর্কে কোনো কথাই কারও কাছে উচ্চারণ করা চলবে না,' আমার দিকে ফিরলেন জমিদার ট্রেলনী, 'জিম, বুঝতে পেরেছো তো?'

মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিলাম।

সাত

ব্রিস্টলে

দশদিনে জাহাজ-নাবিক যোগাড় করতে পারলেন না জমিদার ট্রেলনী, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লেগে গেল।

১৭···সালের ১লা মার্চ, ব্রিস্টলের ওল্ড অ্যাংকর সরাইখানা থেকে ডাক্তার লিভসীর কাছে একটা চিঠি লিখলেন ট্রেলনী। চিঠিটা হলো :

"প্রিয় লিভসী,

জাহাজ কেনা হয়েছে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কেনা হয়ে গেছে। চমৎকার স্কুনার। সহজেই চালানো যায়। পরিবহণ ক্ষমতা দু'শো টন। নাম, হিসপানিওলা।

জাহাজটা যোগাড় করে দিয়েছে আমার পুরোনো বন্ধু, পর্যটক ব্ল্যাণ্ডলি। আমার জন্যে সাংঘাতিক পরিশ্রম করেছে সে। ব্রিস্টলের আরও অনেকেই সাহায্য করেছে আমাকে, তারা জেনেছে গুপ্তধনের সন্ধানে যাচ্ছি আমি।

'ব্ল্যাণ্ডলির কথা : খুব কম দামে পাওয়া গেছে জাহাজটা। কিন্তু দুষ্ট লোকের তো অভাব নেই। তারা বলছে : আসলে এটা ব্ল্যাণ্ডলিরই জাহাজ ছিল। আমাকে বোকা পেয়ে খুব চড়া দামে বিক্রি করেছে, বলেছে জাহাজের মালিক অন্য লোক। মধ্যস্থতার নামে খুব ঠকিয়েছে নাকি সে আমাকে। সে যাই হোক, জাহাজটাকে খারাপ বলতে পারছে না কেউ।

যতটা ভেবেছিলাম, তত সহজে নাবিক যোগাড় হয়নি। নিতান্ত ভাগ্যক্রমে সিলভারকে না পেয়ে গেলে তো নাবিকই জোটাতে পারতাম না। লোকটা বুড়ো, এককালে জাহাজে চাকরি করতো। এখন ব্রিস্টলে একটা সরাইখানার মালিক। আমি নাবিক খুঁজছি শুনে একদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, লোকটার একটা পা নেই।

লোকটার পুরো নাম লঙ জন সিলভার। অমর বীর হুকের অধীনে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিল সে, পা খোয়ায় ওই যুদ্ধেই। নাবিক এবং যোদ্ধা ছাড়াও আরেকটা পরিচয় আছে তার, চমৎকার রাঁধুনী সে। যেচে পড়ে এল, হিসপানিওলার বাবুর্চির কাজটা তাকেই দিয়ে দিলাম। ডাঙায় থেকে থেকে শরীর খারাপ হয়ে গেছে নাকি তার, দূর সাগরের নোনা হাওয়ায় যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, এই আশায়ই বুড়ো বয়সে জাহাজে চড়তে চাইছে সিলভার। হুট করে তাকে চাকরি দেয়ার আরও একটা কারণ আছে। আমাকে আশ্বাস দিল, হিসপানিওলার জন্যে নাবিক যোগাড় করে দিতে পারবে সে। সত্যিই, কথা রেখেছে একপেয়ে নাবিক।

"দেখতে দেখতে নাবিক যোগাড় করে ফেলেছে সিলভার। যে-সে নাবিক নয়, রীতিমত কাজের লোক প্রত্যেকে। চেহারা ওদের খারাপ,

অস্বীকার করছি না, কিন্তু চেহারা দেখে তো বেতন দেবো না। কাঁচা লোক নই আমি, বাজিয়ে দেখে নিয়ে তবেই চাকরি দিয়েছি। অদম্য ওদের মনোবল। দরকার পড়লে লড়াই করানো যাবে ওদের দিয়ে।

'জাহাজের ক্যাপ্টেন নিয়োগ করেছি যাকে, সে তো একটি রত্ন। মেজাজটা অবশ্য একটু কড়া, কিন্তু ক্যাপ্টেনের মেজাজ কড়া না হলে নাবিকেরা তাকে মানবে কেন? খোঁজ পেয়ে নিজেই এসেছে ক্যাপ্টেন, কিন্তু মেট অ্যারোকে আবিষ্কার করেছে সিলভার। সারেঙ লোকটা আবার বাঁশি বাজাতে পারে।

'সিলভারের কথা আরও কিছু বলে নিই। লোকটা হিসপানিওলায় ছোট চাকরি নিয়েছে বটে, কিন্তু তাকে যা-তা ভাবা ঠিক হবে না। ব্যাংকে মোটামুটি টাকা আছে তার নামে। সরাই চালাবার ভার স্ত্রীর ওপর দিয়েছে। মেয়েলোকটি ইংরেজ নয়। সিলভার অবশ্য বলেনি কিছু, কিন্তু কারও কারও ধারণা বৌয়ের দাপট সইতে না পেরেই নাকি পালিয়ে বাঁচতে চাইছে খোঁড়া বাবুর্চী। হাওয়া পরিবর্তনের কথাটা আসলে একটা বাহানা। সে যাই হোক, ওসব নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার কোনো কারণ নেই...'

ট্রেলনীর চিঠিটা আমাকেও পড়তে দিলেন ডাক্তারচাচা। জাহাজ আর নাবিক যোগাড় হয়ে গেছে জেনে দারুণ খুশি হলাম। এই খবরের আশায়ই তো আছি। কিন্তু একটা ব্যাপার মোটেই ভাল লাগলো না আমার। জমিদার নিজেই বললেন, গুপ্তধন আর নক্সা সম্পর্কে কাউকে কিছু বলা হবে না, অথচ তিনি নিজেই কথাটা ফাঁস করে দিয়ে বসে আছেন!

পরদিন গোধূলি বেলায় রয়াল জর্জে এসে দাঁড়ালো ডাক গাড়িটা। রেডরুথ, হান্টার আর জয়েগের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে বসলাম।

ছুটন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে কনকনে হাওয়া এসে ঢুকছে ভেতরে। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে চলেছি। বাড়ির কথা মায়ের কথা মনে পড়ছে বারে বারে। মনে পড়ছে আমাদের সরাই অ্যাডমিরাল বেনবোর কথা। বাবার স্মৃতিটা কেন যেন আজ বেশি করে মনে আসছে, সেই সঙ্গে ভাবছি সরাইয়ের আশপাশের পাহাড় আর সাগরের কথা। ক্যাপ্টেন বোনসও এসে চড়াও হচ্ছে মনের পর্দায়। নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছি। আর কি কোনোদিন ফিরে আসতে পারবো অ্যাডমিরাল বেনবোয় ?

ঠিক কতক্ষণ পরে জানি না, পাঁজরে রেডরুথের কনুয়ের খোঁচায় তন্ময়তা ভাঙলো। বললো সে, 'নেমে পড়ো। ব্রিস্টলে এসে গেছি।'

নামলাম। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছলাম শহর থেকে দূরে, ডকইয়ার্ডে। সারি সারি জাহাজ নোঙর করে আছে। দেশ-বিদেশের নাবিকেরা কোলাহল করছে, গান গাইছে, কাজ করছে। নোনা হাওয়ায় মেশানো আলকাতরার গন্ধটা একেবারে অপরিচিত ঠেকলো না। এই গন্ধ আগেও পেয়েছি, ক্যাপ্টেন বোনসের সিন্দুকের ভেতর থেকে এই গন্ধই বেরোচ্ছিল।

কানে মাকড়ি, ছু-গালের জুলফি পাকিয়ে পাকিয়ে গোল-করা, রঙ-ওঠা পোশাক-পরা মাঝ-বয়েসী এক নাবিককে অবাক চোখে দেখছি, এই সময় সেখানে এসে দাঁড়ালেন ট্রেলনী। জমিদারকে দেখে প্রথমে তো চিনতেই পারলাম না। স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে তাঁর। পরনে নীল রঙা মোটা কাপড়ের নাবিকের পোশাক। কথা, হাসি, চলাফেরার ভঙ্গি ইত্যাদি সব কিছুতেই নাবিকদের অনুকরণ করছেন।

'কেমন আছো, জিম ?' আমার হাত ধরে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন জমিদার।

আমি ভাল আছি জানাতেই বললেন, 'কাল রাতে ডাক্তার লিভসীও এসে পৌঁছেছে। সে-ও ভাল আছে।'

'আমরা কবে যাত্রা করছি, স্যার ?'

'আগামী কাল।'

আট

স্পাই গ্লাস

পরদিন। সকালে নাস্তার পর স্পাই গ্লাস সরাইয়ে যেতে বললেন আমাকে ট্রেলনী। জন সিলভারকে দেবার জন্যে একটা চিঠি দিলেন আমার হাতে। সরাইয়ের ঠিকানাটা বুঝিয়ে বললেন ঃ ডকের ধার ধরে যেতে যেতে সাগরের পাড়েই একটা ছোট্ট বাড়ি, দেয়ালে মস্ত দূরবীনের ছবি আঁকা, ওটাই স্পাই গ্লাস সরাইখানা।

বেরিয়ে পড়লাম। উত্তেজনা আর আনন্দে মশগুল। আরও জাহাজ, আরও নাবিক, নতুন জায়গা দেখার সুযোগ পেয়েছি, এই তো আমি চাই। কর্মব্যস্ত মানুষের ভিড় ডকে। তাদের পাশ কাটিয়ে, মালপত্রের স্তূপ এড়িয়ে এসে দাঁড়ালাম সরাইটার সামনে। ঠিকই বলেছেন জমিদার, সহজেই পাওয়া গেল স্পাই গ্লাস সরাইখানা।

সরাইয়ের বাইরের জায়গাটুকু সুন্দর ছিমছাম। নতুন আঁকা সাইনবোর্ড। জানালায় টকটকে লাল পর্দা। ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

এক কামরার একটা বাড়ির মাঝখানে দেয়াল তুলে দু'ভাগ, অর্থাৎ দু'টো ঘর করা হয়েছে। মেঝে পাকা নয়, চমৎকার করে বালি বিছানো।

মালিকের আজব কিন্তু চমৎকার রুচির পরিচয় পাওয়া যায় এতে। তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরের খদ্দেররা বেশির ভাগই নাবিক। জোরে জোরে কথা বলছে ওরা, এভাবেই হয়তো কথা বলতে অভ্যস্ত নাবিকেরা।

দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। এই সময় ওপাশের ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু সে কে বুঝতে অসুবিধে হলো না। উরুর কাছ থেকে কাটা বাঁ-পা, বাঁ-বগলে ক্রাচ। প্রায় নিঃশব্দে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সাথে হাঁটছে লোকটা। একটা পা-যে নেই, তাতে যেন কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না তার। লম্বা বলিষ্ঠ দেহ। প্রকাণ্ড মুখটা ফ্যাকাসে—হয়তো বয়সের ভারেই, কিন্তু হাসি লেগেই আছে মুখে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। টেবিলগুলোর পাশ দিয়ে চলছে ফিরছে লোকটা, প্রতিটি টেবিলের পাশে থেমে কুশলাদি জিজ্ঞেস করছে, কারও কারও পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে নিতান্ত আপনজনের মতো।

নাহ্, যা সন্দেহ করেছিলাম তা নয়। লোকটা একপেয়ে ঠিকই, নাবিকও ছিল এককালে, কিন্তু সে ক্যাপ্টেন বোনসের সেই ভয়ঙ্কর লোক নয়। আমার দুঃস্বপ্নে দেখা দানব নয় সে। এই হাসি-খুশি চমৎকার লোকটা আর যাই হোক, জলদস্যু হতে পারে না। সবার সাথে লঙ জন সিলভারের ব্যবহার দেখে তাই মনে হচ্ছে আমার।

এগিয়ে গেলাম। পেছন থেকে ডাকলাম, 'মিস্টার সিলভার, স্যার?'

ফিরে চাইলো লোকটা।

'মিস্টার ট্রেলনী দিয়েছেন,'

চিঠিটা বাড়িয়ে ধরে বললাম।

চিঠিটা নিতে নিতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো সিলভার, 'কিন্তু তুমি

কে, খোকা ?' তারপর হঠাৎই যেন অনুমান করে নিয়ে বললো, 'ওহ্-হো বুঝেছি, তুমিই সেই। মানে কেবিন-বয়। ভাল, খুশি হলাম তোমাকে দেখে,' বিশাল এক থাবা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

হঠাৎই ওপাশের ঘর থেকে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো একটা লোক। আমাকে দেখে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখে ফুটলো বিস্ময়, পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে।

সিলভারের থাবা থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে, ওই তো! ব্ল্যাক ডগ!'

'কে ? কি নাম বললে ?' আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে চেয়েছে সিলভার।

ছুটে গেলাম দুই ঘরের মাঝের দরজার কাছে। এক পলকের জন্যে চোখে পড়লো বেরিয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক ডগ। ততক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সিলভার। ব্ল্যাক ডগের পেছনটা দেখতে পেয়েছে সে। 'আরে···ও···ওতো আমার পয়সা না দিয়েই চলে যাচ্ছে। হ্যারি, এই হ্যারি, জলদি ধর ব্যাটাকে!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো দরজার কাছে বসা একজন লোক।

'হাঁ করে আছো কেন, জলদি যাও!' তাড়া লাগালো সিলভার। আমার দিকে ফিরে বললো, 'কি নাম যেন বললে ?'

'ব্ল্যাক ডগ! জলদস্যু!'

'আমার সরাইয়ে ডাকাত! ব্যাটার সাহস তো কম নয়! এই বেন,' আরেকজন লোককে ডেকে আদেশ দিল সিলভার, 'তুমিও যাও। যে করেই হোক ধরে নিয়ে এসো ব্যাটাকে। জলদস্যু! বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো! আমাকে চেনে না!' ঘরের ভেতরের দিকে একটা টেবিলে বসা লোকের দিকে চেয়ে হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলো সে, 'এই, এই মরগান,

তোমার পাশেই তো বসেছিল ও ! এসো, এদিকে এসো !'

হতচকিত হয়ে পড়লো মরগান। উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে এল সিলভারের কাছে। পোশাক-পরিচ্ছদে মনে হচ্ছে নাবিক। মাথার চুল পেকে গেছে, মেহগিনি রঙের চামড়ায় ঢাকা মুখ। হাতের তামাকের ডেলাটা গোল করতে করতে কাঁচুমাচু মুখে এসে দাঁড়ালো সিলভারের সামনে।

'ওই ব্ল্যাক ডগ না কি নাম বললো···ওর সঙ্গে পরিচয় আছে ?'

'জ্বী, না !'

'তবে যে বড় গল্প করছিলে তখন ?'

'মদের টেবিলে যে কোনো অপরিচিত নাবিক পরিচিত হয়ে যায়, আপনিও তো জানেন। সত্যি বলছি, আমি ওকে দেখিনি এর আগে।'

'এবং বেঁচে গেলে এই জন্যেই। এরপর থেকে যদি দেখি, ওই ধরনের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছো, ঝেঁটিয়ে বার করবো আমার সরাই থেকে ! তা কি বলছিল তোমাকে ? সাগর···জাহাজ···ক্যাপ্টেন, এমনি সব শব্দ কানে আসছিল ?'

'এসব নিয়েই তো আলোচনা করে নাবিকেরা···'

'হুঁ, যাও। বসোগে···'

ধীরে ধীরে গিয়ে আবার আগের জায়গায় বসে পড়লো মরগান। সিলভারের দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস হচ্ছে না। তামাকের ডেলাটা গোল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বললো সিলভার, 'মরগান লোক খুব ভাল, কিন্তু হদ্দ বোকারাম।'

দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো সিলভার, তারপর আমার দিকে চেয়ে আপনমনেই মাথা নাড়লো, 'ব্ল্যাক···ব্ল্যাক ডগ···দেখেছি

আগেও লোকটাকে···আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটা অন্ধ লোককে দেখেছো কখনও ? বিচ্ছিরি চেহারা ?'

'নিশ্চই !' উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমি, 'ওই ব্যাটাও ডাকাত ছিল। নাম, পিউ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পিউ,' সায় দিয়ে বললো সিলভার। 'দুই হারামজাদাই আমার দোকানে হরদম আসে যায়, ইদানীং অবশ্য কানাটাকে দেখি না !···ইস্‌স্‌, আগে যদি জানতাম···'

'পিউ তো মারা গেছে। ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে গিয়েছিল···'

এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে ঢুকলো হ্যারি আর বেন। তাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো সিলভার।

'ওকে···ধরতে পারলাম না···' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে হ্যারি, 'ব্যাটা একেবারে গায়েব হয়ে গেছে···'

'তোমাদের দুই গাধাকে দিয়ে কোনোদিন কোনো কাজ হয়েছে ?' খেঁকিয়ে উঠলো সিলভার। 'ইস্‌স্‌, এখন আমি কি জবাব দেবো মিস্টার ট্রেলনীর কাছে ! আমার সরাইয়ে ডাকাতদের আড্ডা, যদি শোনেন তিনি আমাকে কি আর চাকরিতে রাখবেন ! আর আমিই বা কি করি··· যুদ্ধে গিয়ে তো একটা পা খোয়ালাম···পা থাকলে, আরে গাধারা, তোমাদের মতো গায়ের জোর থাকলে, ওই হারামখোর আমার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচে ?'

'যাক যা হবার, হয়েছে,' অভয় দিলাম, 'আমি সব কথা বুঝিয়ে বলবো, মিস্টার ট্রেলনীকে। আপনার কোনো দোষ নেই, দেখতেই তো পেলাম। তাছাড়া সরাইয়ে কত লোক আসে যায়, কি করে বুঝবেন কে ডাকাত আর কে সাধু ?'

'বুদ্ধিমান ছেলে !' হাসিতে ভরে গেছে সিলভারের মুখ। আমার

পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, 'তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি, দেখছি মিথ্যে নয়। এসো, এক গেলাস রাম খাও···' হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল কথাটা তার। 'আরে তাইতো, ডাকাতটা যে আমার তিন গেলাস মদের দাম না দিয়েই চলে গেল···যাকগে, এসো, যা হবার হয়েছে···' আপ্যায়ন করে নিয়ে আমাকে একটা চেয়ারে বসালো সিলভার।

রাম নয়, চা নিলাম আমি। ইতিমধ্যে ট্রেলনীর চিঠিটা পড়ে ফেলেছে সিলভার। ট্রেলনীর সঙ্গে তাকে দেখা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমার পাশে বসে বললো সিলভার, 'একটা কথা কি জানো, বুড়ো আর বাচ্চাদের মাঝে খাতির হতে সময় লাগে না। বুঝতে পারছি, তোমার সঙ্গে আমার বনিবনা ভালোই হবে। তাছাড়া দু'জনের কাজও প্রায় একই ধরনের। তুমি কেবিন-বয়, আমি বাবুর্চি···' বক বক করেই চললো সিলভার।

আমার চা খাওয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়ালাম। সিলভারও উঠলো। সরাই থেকে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে।

ডকের পথটা ধরে চলতে চলতে আমার সঙ্গে আলাপ আরও জমে উঠলো সিলভারের। চমৎকার গল্প বলতে পারে সে, অল্পক্ষণেই বুঝে গেলাম জাহাজ-নাবিক-সাগর সম্পর্কে জ্ঞানও তার অপরিসীম। চলার পথে যে ক'টা জাহাজ দেখলাম, সবক'টার গঠন, কোন্ জাতের কোন্ দেশের জাহাজ ওগুলো, কি মাল বহন করে, কোন্ কোন্ সাগর পথে যাতায়াত,ইত্যাদি সব বললো আমাকে। এরই ফাঁকে ফাঁকে নাবিকদের সম্পর্কেও ছোটখাটো গল্প শোনালো। খুশি হয়ে উঠলাম। সিলভারকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি, জাহাজে সময় আমার ভালোই কাটবে।

ডকের ধারেই একটা সরাইয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ডাক্তারচাচা আর ট্রেলনী। আমাদের দেরি দেখে লাঞ্চ শুরু করে

দিয়েছেন।

কেন দেরি হলো, সব বুঝিয়ে বললো সিলভার। প্রচুর উৎসাহের সঙ্গেই ব্ল্যাক ডগকে ধাওয়া করার ঘটনা বর্ণনা করলো। মাঝে মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আমার দিকে তাকাচ্ছে, সায় দিচ্ছি আমি।

ব্ল্যাক ডগ ধরা না পড়ায় আফসোস করলেন ডাক্তারচাচা আর ট্রেলনী, কিন্তু ঠিকই বুঝলেন, সিলভারেরও কিছু করার ছিল না। সেতো সঙ্গে সঙ্গেই লোক পাঠিয়েছে। ডাকাতটাকে ওরা ধরতে না পারলে খোঁড়া মানুষটার কি করার আছে?

'আজ বিকেল চারটেয়,' কাজের কথায় এলেন ট্রেলনী, 'আবার বলছি, বিকেল চারটেয় নাবিকদের হিসপানিওলায় গিয়ে তৈরি থাকতে বলবে।'

'জ্বী, আচ্ছা,' ঘাড় কাত করলো সিলভার।

'তাহলে যাও এখন।'

সিলভারের চলার পথের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলেন ডাক্তারচাচা। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'নাহ্, লোকটার ওপর কোনো সন্দেহ হচ্ছে না আমার।'

'সন্দেহ মানে? ওর মতো চমৎকার লোক হয় নাকি!' বললেন ট্রেলনী। 'তা আর দেরি কেন? খাওয়া তো হলো, চলো যাই তোমাকে দেখাই জাহাজটা।'

'হ্যাঁ, চলো যাই,' আমাকে দেখিয়ে বললেন ডাক্তারচাচা, 'জিম আসবে সঙ্গে? ও-ওতো দেখেনি জাহাজটা।'

'নিশ্চয়! আসবে না মানে, একশোবার আসবে! চলো জিম, তুমিও চলো।'

নয়

বারুদ-বন্দুক

জাহাজে উঠতেই এগিয়ে এসে আমাদের সালাম জানালো মেট অ্যারো। চামড়ার রঙ তামাটে, চোখ ট্যারা, কানে ইয়ারিং। কোনো এক সময় নৌবাহিনীতে ছিল হয়তো। ট্রেলনীর সঙ্গে তার সদ্ভাব, সহজেই বোঝা যায়।

অ্যারোর সঙ্গে কথা বলছেন ট্রেলনী, এই সময় কয়েকজন নাবিকের পেছনে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন হিসপানিওলার ক্যাপ্টেন। রুক্ষ কিন্তু ধারালো চেহারা। সারাক্ষণই যেন রেগে আছেন। ভদ্রতার ধার-কাছ দিয়েও গেলেন না ক্যাপ্টেন, এসেই শুরু করলেন, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে, মিস্টার ট্রেলনী।'

'ও, ক্যাপ্টেন স্মলেট?' ভুরু কুঁচকে গেছে জমিদারের, 'কি কথা?'

'সোজাসুজিই বলছি। এই জাহাজের লোকজনদের মোটেই ভাল লাগছে না আমার।'

'জাহাজটাও নিশ্চয় ভাল লাগছে-না আপনার?' কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল রেগে গেছেন ট্রেলনী।

'জাহাজটা সত্যিই ভাল কি মন্দ, জানি না এখনও। না চালিয়ে কোনো মন্তব্য করবো না।'

'জাহাজ পছন্দ নয়, নাবিকেরা ভাল নয়, তাহলে নিশ্চয় হিসপানিওলার মালিককেও আপনার সুবিধের মনে হচ্ছে না?'

তর্কবিতর্ক খারাপ দিকে মোড় নিচ্ছে, বুঝে, হাত তুলে থামালেন দু'জনকে ডাক্তারচাচা, 'আরে কি শুরু করলেন আপনারা?' ক্যাপ্টেনের পক্ষ নিয়ে বললেন তিনি, 'ক্যাপ্টেন স্মলেট একটা কথা বলেছেন, সেটা সত্যি কি মিথ্যে না জেনে খামোকা তর্ক বাধাচ্ছো কেন, স্কয়ার? জাহাজের ভার তাঁর ওপর, কাজেই ভালমন্দ সব বিষয়েই কথা বলার অধিকার ক্যাপ্টেনের আছে। হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, বলুন, কেন এই অভিযান আপনার পছন্দ নয়?'

'চাকরি দেবার সময় আমাকে বলা হয়েছে, একটা গোপন মিশনে চলেছে হিসপানিওলা। কিন্তু জাহাজে উঠে দেখি, ওমা, নাবিকেরা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে কেন কোথায় যাচ্ছে জাহাজ। এটা কেমন ধরনের কথা, স্যার?'

'ভুল বলেননি আপনি,' ক্যাপ্টেনের স্বপক্ষে রায় দিয়ে বললেন ডাক্তারচাচা।

'আরও কথা আছে। নাবিকেরা বলাবলি করছে, গুপ্তধনের সন্ধানে যাচ্ছে এই জাহাজ। নাবিকদের মুখে কথা ছড়ায় বেশি। কোথায় কোন্ ডাকাতের দল শুনবে কথাটা, ব্যস, পিছু নেবে···বেঁচে আর ফিরে আসতে হবে না। আপনিই বলুন, জেনেশুনে কে মরতে যায়?'

'আপনার এই অভিযোগও ফেলনা নয়, বললেন ডাক্তারচাচা। 'কিন্তু নাবিকদের পছন্দ করছেন না কেন?'

'দেখুন স্যার, শুনেছি আপনি ডাক্তার। রোগীর চেহারা দেখেই ভেতরের অনেক কিছু আঁচ করতে পারেন। আমি নাবিক, সারাজীবন নাবিকদের মাঝে কাটিয়েছি। চোখ দেখে ওদের চরিত্র অন্তত কিছুটা

বুঝবো না, ভাবলেন কি করে ? কথাটা যখন উঠেই পড়লো, তো বলি, এই জাহাজ সামলানোর ভার আমার। সুতরাং নাবিকদের ভারও আমার ওপরই থাকবে। সেক্ষেত্রে নাবিক যোগাড়ের ভারটাও আমার ওপর দেয়াই উচিত কাজ হতো আপনাদের।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' বললেন ডাক্তারচাচা। 'কিন্তু কাকে কাকে পছন্দ হয় না আপনার, বলুন তো ? মেট অ্যারোকে কেমন মনে হয় আপনার ?'

'নাবিক হিসেবে খারাপ না। তবে তার স্বভাব অফিসারের মতো নয়। মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে বসে মদ খায়...'

'মদ খেলে কি হলো ! আপনি খান না ?' খেঁকিয়ে উঠলেন ট্রেলনী।

'খাই,' কর্কশ হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেনের গলা, 'কিন্তু আমার বক্তব্য সেটা নয়। আমি বোঝাতে চাইছি, মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে বসে মদ খাওয়া জাহাজের অফিসারদের জন্যে বেমানান।'

'পরিষ্কার করে বলুন তো, ক্যাপ্টেন, কি বলতে চান আপনি ?' প্রশ্ন করলেন ডাক্তারচাচা।

'সত্যিই এই অভিযানে যাবার ইচ্ছে আপনাদের আছে ?'

'নিশ্চয় !' বললেন জমিদার। তাঁর রাগ কমেনি, 'নইলে এত খরচাপাতি কিসের জন্যে ?'

'বেশ। তাহলে বলছি, যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আমার আদেশে সব চলবে হিসপানিওলায়। কাণ্ডটা দেখুন তো ! নিচে সুন্দর স্টোররুম থাকতে জাহাজের সামনে এনে জমা করেছে সব গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র ! ওগুলো সরাবো আমি এখান থেকে। তা-ছাড়া যে চারজন লোককে ওই গোলাবারুদের প্রহরায় রাখা হয়েছে, তাদের কোনো দরকার নেই। ওরা থাকবে নিজের নিজের কোয়ার্টারে।'

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম,' বললেন ট্রেলনী, 'আর কিছু বলবেন ?'

'বলবো। হিসপানিওলা কোন্ উদ্দেশ্যে অভিযান চালাবে, বড় বেশি জানাজানি হয়ে গেছে···'

'ঠিকই বলেছেন আপনি, ক্যাপ্টেন,' সায় দিলেন ডাক্তারচাচা।

'নিজের কানে শুনেছি আমি, আপনাদের কাছে দ্বীপের ম্যাপ আছে। সেই ম্যাপে চিহ্নিত করা আছে কোথায় গুপ্তধন মিলবে। দ্বীপটার অবস্থানও জানি, মানে শুনেছি···' গড়গড় করে অবস্থানটা সঠিক আউড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

'আশ্চর্য তো !' বললেন জমিদার, 'আমি এ কথা কাউকে জানাইনি !'

'অথচ হিসপানিওলার নাবিকদের কারও অজানা নেই !' থমথমে গম্ভীর ক্যাপ্টেনের মুখ।

'কে বললো তাহলে ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার আমার একবার ডাক্তারচাচার মুখের দিকে তাকালেন জমিদার।

'বেশি কথা বলি না আমি, তুমি জানো,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ডাক্তারচাচা। 'আর জিমও বেঁফাস কথা বলার ছেলে নয়।'

কি বলতে যাচ্ছিলেন জমিদার, কিন্তু তার আগেই বলে ফেললেন ক্যাপ্টেন, 'কার কাছে আছে ম্যাপটা জানি না, জানতে চাইও না। কিন্তু দেখবেন, খুইয়ে না বসেন ওটা।'

'গুপ্তধন···ম্যাপ···গোলাবারুদ··· ! ক্যাপ্টেন, আপনি কি বিদ্রোহের আশংকা করছেন ?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তারচাচা।

'এ-ব্যাপারে খোলাখুলি এখুনি কিছু বলতে পারবো না, মাপ করবেন। আমার সন্দেহ হয়েছিল, জানালাম, পরে যেন দোষ না দিতে পারেন আমাকে। জাহাজের ক্যাপ্টেন আমি, জাহাজের নিরাপত্তার

দায়িত্বও তাই আমার। আমাকে পুরো স্বাধীনতা আর জাহাজের শাসন ক্ষমতা দিতে হবে। নইলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই মুহূর্তে নেমে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না আমার।'

একবার জমিদারের দিকে তাকালেন ডাক্তারচাচা, তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'ক্যাপ্টেন স্মলেট, আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না আর।'

'আপনি বুদ্ধিমান শুনেছি,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'ঠিকই শুনেছি।'

'ডাক্তার যখন বলছে,' বললেন জমিদার, 'আমার বিশেষ আপত্তি থাকার কথা নয়।'

'বড় বড় কথা বলে ফেললাম, মাপ করবেন আমাকে, মিস্টার ট্রেলনী, স্যার,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'আমাকে আমার মতো কাজ করতে দিন, কথা দিচ্ছি, কোনো ফাঁকি কিংবা অবহেলা পাবেন না।' আর একটাও কথা না বলে ঘুরে চলে গেলেন স্মলেট।

'দু'জন খাঁটি লোক যোগাড় করেছো হে তুমি, জমিদার,' বললেন ডাক্তারচাচা, 'একটি ওই জন সিলভার, আরেকটি এই ক্যাপ্টেন।'

'এটার চাইতে সিলভার অনেক ভাল,' মুখ গোমড়াই রয়েছে জমিদারের। 'এই ব্যাটা তো ব্যবহারই জানে না। ইংরেজের বাচ্চা অমন হতে দেখিনি কখনও।'

'হয়েছে, হয়েছে, রাগ বাদ দাও···' বললেন ডাক্তারচাচা।

জাহাজের সব ব্যবস্থা আবার ঢেলে সাজানো শুরু হলো। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু তদারক করছেন ক্যাপ্টেন, তাঁকে সাহায্য করছে মেট অ্যারো।

জোর কাজ চলছে, এই সময় একটা নৌকায় করে কয়েকজন লোক এল। সবাই হিস্পানিওলার চাকুরে, সবশেষে এসেছে। তাদের মধ্যে

সিলভারও আছে।

একটা পা নেই, কিন্তু ঝোলানো দড়ি বেয়ে বানরের মতো ক্ষিপ্রতায় ডেকে উঠে এল সিলভার। উঠেই প্রশ্ন করলো, 'একি ? কি হচ্ছে ?'

'গোলাবারুদ সরাচ্ছি,' বললো একজন নাবিক।

'কেন ? দেরি হয়ে যাবে যে তাহলে ? আজকের জোয়ার ধরতে পারবো না !'

'এই, তোমার এত মাতব্বরী কেন ?' ধমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'রান্নাঘরে যাও ! খাওয়ার ব্যবস্থা করগে···যত্তোসব···' গজ গজ করে উঠলেন তিনি।

'মাপ করবেন, স্যার, এই যে যাচ্ছি···' তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের উদ্দেশে চলে গেল সিলভার।

'মনে হচ্ছে কথা একটু বেশি বলে,' মন্তব্য করলেন ডাক্তারচাচা, 'তবে লোক ভাল··· ব্যবহারেই বোঝা যায়।'

'হবে হয়তো !' বললেন স্মলেট। কথাবার্তা শুনতে একটু বেশিই এগিয়েছিলাম, ক্যাপ্টেনের নজরে পড়ে গেলাম। খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এই, এই ছেলে, তুমি এখানে কি করছো ? যাও, রান্নাঘরে যাও। বাবুর্চিকে সাহায্য করগে।'

তিলমাত্র বিলম্ব না করে ঘুরেই চলতে লাগলাম। পেছনে ক্যাপ্টেনের গজগজানি শোনা গেল, 'কোনো সুপারিশ, পেয়ারের লোকটোক চলবে না আমার জাহাজে। কাজ করতে হবে···'

স্কয়ার ট্রেলনীর সঙ্গে সেই মুহূর্তে একমত হলাম আমি। অসহ্য লোক ক্যাপ্টেন স্মলেট। তাঁর প্রতি গভীর বিতৃষ্ণায় ভরে গেল আমার মন।

দশ

সমুদ্র যাত্রা

কর্মব্যস্ততার মাঝে কাটলো সারাটা রাত। এক রাতে এর অর্ধেক কাজও কখনও করিনি অ্যাডমিরাল বেনবোয়। নতুন সংসার গোছানোর মতোই ক্যাপ্টেনের আদেশে হিসপানিওলার মালপত্র গোছগাছ করতে হলো আমাদের। এর ওপর অতিথিদের অভ্যর্থনা আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো অবস্থা করে ছাড়লো। অতিথিরা সবাই ব্রিস্টলের লোক—মিঃ ব্ল্যাণ্ডলি আর স্কয়ার ট্রেলনীর নতুন বন্ধু বান্ধব, সবাই বিদায় জানাতে এসেছে। ভোরের আগে যখন কাজ শেষ হলো, জাহাজ ছাড়ার প্রথম সংকেত জানালো সারেঙ ভেঁপু বাজিয়ে, নোঙর তোলার জন্যে তৈরি হলো মাঝিমাল্লারা, আমার সারা শরীর ভেঙে এল দারুণ ক্লান্তিতে। ঘুম জড়িয়ে এল দু'চোখে, কিন্তু ডেক ছেড়ে যেতে মন চাইলো না। যা-কিছু দেখছি শুনছি—ওপরওলাদের নির্দেশ, নাবিকদের হাঁক-ডাক, হুইসেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, লণ্ঠনের আলোয় জাহাজের ডেকে লোকের চলাফেরা, ইত্যাদি সবই যেমন অভিনব আমার কাছে, তেমনি চিত্তাকর্ষক।

এই সময় একজন নাবিক বলে উঠলো, 'এই বারবিকিউ, একটা গান ধরতো, নইলে জমছে না!'

পাশে দাঁড়ানো আরেকজন বললো, 'সেই পুরোনো গানটা, যেটা গাইতাম এককালে···'

'ঠিকই বলেছিস্। গান গাওয়া দরকার এখন,' রান্নাঘর থেকে ডেকে কখন বেরিয়ে এসেছে লঙ জন, দেখিনি। তার ক্রাচের আওয়াজও শুনিনি। লোকটা চলে ছায়ার মতো নিঃশব্দে। তার আরেক নাম তাহলে বারবিকিউ!

গেয়ে উঠলো সিলভার। চমকে উঠলাম আমি, ভীষণভাবে। এই গান, এই সুর আমার অতি পরিচিত। সিলভার শুরু করতেই তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোরাস ধরলো সবাই: "সিন্দুকটা মরা মানুষের, চড়াও হলো পনেরো নাবিক··"। রেলিঙ ধরে দাঁড়ানো নাবিকেরা "ইয়ো হো হো কী মজা!" বলার সময় রেলিঙে জোর ধাক্কা মারলো। উত্তেজনা প্রকাশ পেল ওদের ভঙ্গিতে।

অ্যাডমিরাল বেনবোয় ভেসে গেল আমার কল্পনা—মনে হচ্ছে এই গায়কদের মাঝে ক্যাপ্টেন বোনসের কণ্ঠ শুনছি।

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আদেশ পেয়েই নোঙর তুলতে শুরু করলো নাবিকেরা। বিচিত্র শব্দে 'ক্যাপস্টান'-এ জড়াচ্ছে শিকল, পানি থেকে উঠে আসা অংশটুকু থেকে পানি গড়াচ্ছে। রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে নিচে উঁকি দিলাম। ধীরে ধীরে লোনাপানির তলা থেকে উঠে এল তেমাথা নোঙরটা, আবছা ধূসর আলোয় মনে হলো কোনো দানবের বাঁকানো নখ উঠে আসছে আমাদের ভাগ্যকে আঁচড়ে রক্তাক্ত করে দিতে। কেমন যেন ছম ছম করে উঠলো গা।

পাল খাটানো হয়ে গেল। ধীরে ধীরে পিছোতে শুরু করলো হিস-পানিওলা। ডকের অন্যান্য জাহাজগুলোর কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসছে। পুবের আকাশে ধূসর আলোর আভাস। ক্রমেই ছোট

হয়ে আসছে জাহাজগুলো। আর দাঁড়াতে পারছি না, কিছুতেই খোলা থাকতে চাইছে না চোখের পাতা। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবিনে গিয়ে ঢুকতে হলো।

সেই দিনটা এবং তার পরের দিনও একঘেয়ে ভাবেই কেটে গেল। কোনো নতুনত্ব নেই। চারদিকে কেবল পানি আর পানি। তীর থেকে যতই দূরে সরে যাচ্ছে হিসপানিওলা, সাগর-পাখিদের সংখ্যাও কমতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আর একটাকেও দেখা গেল না।

জাহাজের পরিবেশে প্রথম নতুনত্ব আনলো মেট অ্যারো। ক্যাপ্টেনের কথাই ঠিক, লোকটা মোটেও সুবিধের নয়। কাজকর্ম করতেই চায় না, খালি ফাঁকি দেবার তালে থাকে। নিজেকে মাঝিমাল্লাদের সমকক্ষ মনে করে, হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে মেতে ওঠে ওদের সঙ্গে। প্রায় সারাক্ষণই মদ গিলে মাতাল হয়ে থাকে। এহেন লোককে দিয়ে একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসারের কর্তব্য করানোর চেষ্টা বৃথা।

অ্যারোকে অনেক রকমে সাবধান করলেন ট্রেলনী, ছোটখাটো শাস্তিও দিলেন, কিন্তু ফল হলো না। আরও বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো অ্যারো। মাতাল অবস্থায় একদিন ডেকে এসে দড়ির স্তূপ কিংবা অন্য কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে কপাল কাটলো, পায়ের গোড়ালি মচকালো, দু'একজনের সঙ্গে মারপিটও বাধালো। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে জোর করে শুইয়ে দিতে হলো নিজের বাংকে।

অ্যারোকে মদ সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দেবার আদেশ দিলেন ট্রেলনী, আদেশ পালনও করলো সিলভার। কিন্তু কোনো কাজই হলো না। কোথা থেকে যেন ঠিকই মদ আসে অ্যারোর কাছে! মেটের ওপর লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা হলো, কিন্তু রহস্যের সমাধান হলো না। আগের মতোই মদ খায়, মাতাল হয়ে থাকে অ্যারো, গোলমাল বাধায়। কোথায়

মদ পায় সে, জিজ্ঞেস করলে কথা বলে না, শুধু হাসে। তার মাতলামিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মাঝিমাল্লারা। অ্যারোকে বেঁধে রাখার কথা ভাবলেন ট্রেলনী, কিন্তু তার দরকার হলো না।

এক অন্ধকার ঝড়ের রাতে জাহাজ থেকে গায়েব হয়ে গেল মেট অ্যারো। কিন্তু এতে অবাক হলো না কেউই। মাতাল অবস্থায় হয়তো খোলা ডেকে উঠে এসেছে, রেলিঙের ধারে গিয়েছে, ঝড়ো বাতাস উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে তাকে পানিতে।

গম্ভীর মুখে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আপদ গেছে, ভালোই হয়েছে!'

নামেমাত্র মেট একজন ছিল এতদিন, এখন আর তা-ও রইলো না। একজন মেট দরকার আছে। কাজেই ভেবেচিন্তে সারেঙ জোব অ্যাণ্ডারসনকে এই পদ দেয়া হলো। অবশ্য সারেঙের কাজও তাকেই করতে হবে। সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করে গেল অ্যাণ্ডারসন। তাকে সাহায্য করলেন ট্রেলনী। কথার ছলে বলে ফেলেছিলেন অ্যাডমিরাল হবেন, কিন্তু আসলে ক্যাপ্টেন হবার যোগ্যতাও তাঁর নেই। তবে সাগরভ্রমণে অভিজ্ঞতা আছে প্রচুর। জাহাজের ছোটখাটো অনেক কাজ বেশ ভালমতই চালাতে পারেন। আবহাওয়া ভাল থাকলে এমনকি গার্ডের কাজ করতেও দ্বিধা করেন না।

পরিণতবয়স্ক, সাবধানী, চতুর এবং সাগর সম্পর্কে অভিজ্ঞ নাবিক ইসরায়েল হ্যাণ্ডস। কোনো কাজের দায়িত্ব তার ওপর দিয়ে নির্ভর করা যায়। ইসরায়েলকে দারুণ পছন্দ সিলভারের, বিশ্বাসও করে খুব।

বাবুর্চি হিসেবে সিলভারের তুলনা হয় না। ধীরে ধীরে জানলাম, শুধু রান্নাই নয়, জাহাজের অনেক কাজই সে জানে। একটা পা নেই, তবু তার স্বচ্ছন্দ চলাফেরা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। জোর বাতাস বইলে সাগরে উথালপাতাল বড় বড় ঢেউ ওঠে, ঝর্ণায় ভাসানো বাদামের

খোসার মতো দুলতে শুরু করে জাহাজটা। এই দুলুনির মাঝেই ক্রাচটা বগলে চেপে ধরে খোলা ডেকে যেভাবে স্বচ্ছন্দে হাঁটে সিলভার, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

হিসপানিওলার নাবিকেরা বলে, 'সাধারণ মানুষ নয় বারবিকিউ। আমাদের মতো অশিক্ষিতও নয়, ছেলেবেলায় ভালোই লেখাপড়া শিখেছে। আর সাহস?—সেটা না দেখলে বিশ্বাস করবে না, খোকা। তেড়ে আসা সিংহের সামনেও খালি হাতে রুখে দাঁড়াতে দেখেছি ওকে!'

নাবিকেরা সবাই সম্মান করে সিলভারকে। আমি কিন্তু ভালবাসতে শুরু করেছি একপেয়ে বাবুর্চিকে। আমাকে দারুণ স্নেহ করে সে। আমার কাজ, মানে ডিশটিশগুলো সুযোগ পেলেই ধুয়ে দেয় সিলভার। হাতে কাজ না থাকলে পুরোনো দিনের গল্প শোনায়। একটা পোষা তোতাপাখি আছে তার। সেটা থাকে ঝকঝকে পরিষ্কার রান্নাঘরের এক কোণে, খাঁচায়।

গল্প বলার সুযোগ পেলেই আমাকে ডাকে সিলভার, 'জিম, এসো, তোমাকে গল্প শোনাই।' একদিন বললো, 'তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে, জিম। আর ওই তোতাটাকেও ভালবাসি আমি। ওর নাম কি রেখেছি জানো?—ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট। চমকে উঠলে মনে হচ্ছে? ওই জলদস্যুর নাম তাহলে তোমারও জানা। গুড,' তোতাপাখিটার দিকে চেয়ে বললো সে, 'ক্যাপ্টেন, আমাদের অভিযান সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় চলে গেছে সিলভার!

কথা বলে উঠলো তোতা, 'পিসেস অফ এইট, পিসেস অফ এইট ...,' বার বার এই কথাটাই আউড়ে গেল পাখিটা। খাঁচার ওপরে রুমাল ছুঁড়ে পাখিটাকে থামালো সিলভার।

আমার দিকে তাকিয়ে বললো বাবুর্চি, 'পাখিটার বয়েস কত হবে, জিম? যদি বলো দু'শো, তাতেও অবাক হবো না। এরা নাকি অমর। আমার এই তোতাটা কিন্তু অনেক দেখেছে জীবনে। অনেক হাত ঘুরে শেষে আমার সম্পত্তি হয়েছে। বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপ্টেন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে জাহাজে জাহাজে ঘুরেছে। মাদাগাস্কার, মালাবার, সুরিনামা, প্রভিডেন্স, পোর্তোবেলোয় গিয়েছে। ডুবে যাওয়া একটা জাহাজ তুলতে দেখেছে একবার। ভেঙে যাওয়া জাহাজটায় সাড়ে তিন লাখ মুদ্রা ছিল। মুদ্রাগুলোকে পিসেস অফ এইট বলছিল নাবিকেরা। শুনেছে, ব্যস্ মুখস্ত করে বসে আছে!' তোতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যাপ্টেন, বারুদের গন্ধ পেয়েছো?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল পাখি, 'পালানোর জন্যে তৈরি থাকো।'

জন সিলভার আর তোতাটার মাঝে এই ধরনের কথাবার্তা দুর্বোধ্য ঠেকে আমার কাছে।

'চমৎকার বলেছো হে,' বলে পকেট থেকে চিনি বার করে খেতে দিল পাখিটাকে সিলভার। মাঝেমধ্যে খাঁচার শিক ঠোকরাতে ঠোকরাতে জঘন্য গালাগালি শুরু করে আজব পাখিটা, কোনো কারণ ছাড়াই। আমি সামনে থাকলে লজ্জিত হাসি হাসে সিলভার, 'বদলোকের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে তো, গালাগালিগুলোও দিব্যি রপ্ত করে বসে আছে। হায় কপাল!' নিজের কপালে আলতো করে চাপড় মারে বাবুর্চি। নাহ্, লোকটা নেহায়েতই ভালমানুষ, মনে হয় আমার। পাখিটার গালাগালিও অভদ্রতা মনে হচ্ছে তার কাছে।

এদিকে ক্যাপ্টেন আর জাহাজের মালিক ট্রেলনীর মাঝে একটা বিরাট দূরত্ব রয়েই গেছে। এব্যাপারে অবশ্য জমিদারের কোনো মাথাব্যথা নেই, তাঁর জাহাজ ঠিকমতো চললেই হলো। ক্যাপ্টেনও যেচে

এসে কোনো কথা বলে না মালিকের সঙ্গে। ট্রেলনী কখনও কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে, কাটা কাটা জবাব দেন ক্যাপ্টেন। রেগে যান জমিদার। থমথমে মুখে পায়চারি করতে থাকেন সাড়া ডেকে। মাঝে মাঝেই মুখ তুলে তাকান এই সময় আকাশের দিকে। বিড়বিড় করে ওঠেন কখনও, 'ব্যাটাকে এবার তাড়াতে হবে! অসহ্য···'

প্রচণ্ড ঝড় উঠলো একদিন। জাহাজটা দেখতে যেমনই হোক, তার গুণের পরিচয় পাওয়া গেল এই সময়। ভয়ংকর ঢেউয়ের মাঝে দোল খেলো হিসপানিওলা, বাতাসের ঝাপটায় কাত হয়ে গিয়ে ডোবে ডোবে অবস্থা হলো, কিন্তু ডুবলো না। কোনো ক্ষতিই হলো না জাহাজের। সাংঘাতিক শক্ত কাঠামো।

জাহাজটা ভাল, এতদিনে স্বীকার করলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু মালিকের বাড়াবাড়ি আরও অসহ্য হয়ে উঠছে, এটাও জানালেন। অনিশ্চিত অভিযানে চলেছে হিসপানিওলা, কবে ফিরবে ঠিক নেই। এই অবস্থায় নাবিকদের প্রচুর মদ খাবার অনুমতি দেয়া একেবারেই উচিত হয়নি ট্রেলনীর, ক্যাপ্টেনের ধারণা। আর কি জমিদারী ব্যবস্থা! দু'দিন যেতে না যেতেই জাহাজশুদ্ধ লোককে দামী খাবার খাওয়ানোর ঘটা। ফলমূলের ব্যাপারে তো দরাজ ব্যবস্থার অন্তই নেই। বিশাল এক পিপে আপেল রেখে দেয়া হয়েছে ডেকে। যার যখন খুশি নিয়ে খেতে পারে, সেরকম নির্দেশ আছে ট্রেলনীর।

আর সবার মতো আমিও মন চাইলেই পিপে থেকে আপেল নিয়ে খাই। সেদিন আপেল খেতে গিয়েই জেনে গেলাম সাংঘাতিক ব্যাপারটা।

স্বচ্ছন্দ গতিতে ভেসে চলেছে হিসপানিওলা। পালে জোর হাওয়া লেগেছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেজার আইল্যাণ্ড চোখে পড়বে, আশা

করছেন ক্যাপ্টেন। আমি, ডাক্তার লিভসী, স্কয়ার ট্রেলনী সবাই খুশি। নিরাপদেই গন্তব্যে পৌঁছতে যাচ্ছে আমাদের জাহাজ।

সূর্য অস্ত গেছে। ধূসর সন্ধ্যাকে গিলে খেতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে রাতের অন্ধকার। সারাটা দিন খেটেছি, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে শরীর। সকাল সকালই শুতে যাবার ইচ্ছে। আগামী সকালে উঠেই হয়তো দেখতে পাবো দ্বীপের গায়ে ভেড়ানো আছে জাহাজ। কর্ম-ব্যস্ততা বাড়বে তখন। কাজেই আজ রাতে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।

ডেকের উপর দিয়ে নিজের বাংকে যাবার সময় পিপেটার ওপর চোখ পড়লো। একটা আপেল খেলে মন্দ হয় না। এগিয়ে গেলাম।

প্রায় শেষ হয়েছে এসেছে আপেল। বিশাল পিপের তলায় পৌঁছে গেছে একেবারে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পেলাম না আমি। খেতে হলে পিপের ভেতরে নামতে হবে আমাকে। ঢুকেই পড়লাম। ওখানে বসেই খেলাম একটা আপেল। তারপর তুলে নিলাম আরও একটা। এই সময় কে একজন এসে ধপ করে বসলো পিপের গায়ে হেলান দিয়ে। আরও পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সব ক'জনই এগিয়ে এসে বসে পড়েছে পিপেটার কাছে। বেরিয়ে আসবো, এমনি সময় কথা বলে উঠলো একজন। সিলভারের গলা। প্রথম বাক্যটা শুনেই চমকে উঠ-লাম। বসে পড়লাম আবার। দুরু দুরু বুকে শুনতে লাগলাম ওদের অবিশ্বাস্য কথাবার্তা।

এগারো

পিপের ভেতরে বসে শোনা কথা

'না না, আমি নই, ক্যাপ্টেন ছিল ফ্লিন্ট,' সিলভারের গলা শোনা গেল, 'আমি ছিলাম কোয়ার্টার মাস্টার। ওই অভিযানেই পা হারিয়েছি আমি, পিউ হারিয়েছিল চোখ...'

'তারমানে ফ্লিন্ট ছিল সর্দার?' একজন প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ,' বললো সিলভার, 'ভয়ংকর লোক ছিল। তার দলের সবাই ছিল তারই মতো বেপরোয়া, নিষ্ঠুর, খুনী। ওই পিউ ছিল ফ্লিন্টের সহকারী। অথচ দেখো, পিউ, এমনকি ফ্লিন্টও আমাকে পরোয়া করে চলতো। ভয়ে ভয়ে থাকতো সারাক্ষণ, কখন আবার ফ্লিন্টকে খুন করে তার সর্দারী নিয়ে নিই। কিন্তু সেরকম কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। সর্দার হলেই ঝামেলা বাড়ে। তারচে এমনিতেই যখন সবাই সমঝে চলতো আমাকে, কেন খামোকা ঝুঁকি নিতে যাই?'

'তোমার নাম শুনেছি আগেই,' বললো আগের লোকটা। জাহাজে সবচেয়ে কম বয়েসী নাবিক সে। 'জলদস্যুর দলে ছিলে, তা-ও শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এতদিন।'

'এখন তো জানলে?' এগিয়ে গেল সিলভার। 'এসো, হাত মেলাও।'

বুঝলাম, এই অল্প বয়েসী নাবিকটি আগে ডাকাতদলে ছিল না, কিন্তু আজ থেকে তাকে নিজের দলে টেনে নিল জন সিলভার।

'খুব ভাল, ডিক,' নাবিকটিকে উদ্দেশ্য করে বললো অন্য একজন। গলা শুনেই বুঝতে পারছি, ইসরায়েল হ্যাণ্ডস। 'আমাদের দলে এসে ভাল করেছো। এই নাবিকগিরি করে আর কয় পয়সা কামাতে? এখন ঠিকমতো কাজটা উদ্ধার করতে পারলেই টাকার বিছানায় ঘুমাবে।' সিলভারকে বললো, 'তা বারবিকিউ, আর কতদিন? ক্যাপ্টেন ব্যাটাকে আর সহ্য করতে পারছি না। এভাবে ক'দিন থাকবো আর?'

'তোমার মাথায় গোবর পোরা, বরাবরই বলে এসেছি,' বিরক্ত শোনাচ্ছে সিলভারের গলা, 'টাকা কি ছেলের হাতের মোয়া, চাইলেই পেয়ে যাবে? সহ্য করতে হবে। দেরি আছে এখনও...'

'কেন, দেরি কেন? দ্বীপটা তো এসে গেল...'

'দেরি এই জন্যে, তোমরা কেউ জাহাজ চালাতে জানো না। ওই "অসহ্য" ক্যাপ্টেনটাকেই সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। এখন তো বটেই, ফিরতি পথেও দরকার হবে স্মলেটকে। তাছাড়া, গুপ্তধনের নক্সাটাও তো এখনও হাতে পেলাম না। আমি জানি, ট্রেলনী কিংবা ডাক্তার, এদের কারও কাছেই আছে ওটা। এখুনি চোটপাট শুরু করলে বলা যায় না, নক্সাটা ধ্বংস করে ফেলতে পারে ওরা। সেক্ষেত্রে সবই মাটি।'

'নক্সার ব্যাপারটা নাহয় মেনে নিলাম, কিন্তু ক্যাপ্টেন? ওকে কেন দরকার হবে? আমরা জাহাজ চালাতে পারি না, কে বললো? নাবিক নই আমরা? এখন কে চালাচ্ছে, শুনি?'

'তোমরা গতরে খাটছো শুধু, ব্রেনটা ক্যাপ্টেনের। হিসেব জানো? ম্যাপ দেখে বলে দিতে পারবে কোথায় আছো এখন? বলতে পারবে

কয়েক ঘণ্টা পর কোন্‌দিকে বইবে বাতাস, কতটা জোরে ? পারবে না। এরজন্যে লেখাপড়া জানা দরকার। জাহাজের হাল ধরা, দাঁড় বাওয়া কিংবা পাল খাটানোর কাজে তোমাদের জুড়ি নেই, কিন্তু পুরো একটা জাহাজকে কন্ট্রোল ?—সেটা তোমাদের দিয়ে হবে না।'

'কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি ?'

'এই জন্যেই বলেছিলাম, মাথায় গোবর পোরা আছে। জীবনে অনেক দেখেছি আমি, অনেক ভুগেছি। জাহাজে করে দুর্গম সাগর পাড়ি দিয়েছি, পাহাড়ে চড়েছি, মরুভূমি পেরিয়েছি। অনেক, অনেক লোক দেখেছি, তারা কেউ বোকা, কেউ বা বুদ্ধিমান। অনেক বুদ্ধিমানকে দেখেছি, সামান্যতম ভুলের জন্যে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। বেশির ভাগ ভুল কি করেছে জানো ?—তাড়াহুড়া। কাজেই সাবধান !'

'কিন্তু একটু রাম খেয়ে হৈ-হুল্লোর করতে পারি না, কুত্তার মতো এসে ঘেউ ঘেউ শুরু করে স্মলেট। ব্যাটার ঘাড় ধরে পানিতেই ফেলে দেবো একদিন !' গজগজ করে উঠলো ইসরায়েল।

'আরেকটা জিনিস এই রাম !' ইসরায়েলের কথায় কান দিল না সিলভার। 'পিউয়ের কি কম টাকা ছিল ? অথচ ভিখিরি হয়ে মরেছে। কেন জানো ? রাম গিলে গিলে। ফ্লিন্টের মৃত্যুর কারণও ওই রাম !'

'তাহলে কি করবো আমরা এখন ?' জানতে চাইলো কম বয়েসী নাবিক ডিক।

'আপাততঃ কিছুই না। চুপচাপ শুধু দেখে যাবো। জাহাজ দ্বীপে ভেড়াবে ক্যাপ্টেন, নক্সার সাহায্যে গুপ্তধন খুঁজে বার করবে ডাক্তার আর ট্রেলনী, তারপর শুরু হবে আমাদের কাজ। প্রথমেই ট্রেলনী আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের খতম করে ফেলবো। আমাদের হয়ে জাহাজ-টাকে আবার নিরাপদ কোনো জায়গায় নিয়ে যাবে স্মলেট, এমন

কোথাও, যেখান থেকে সহজেই কেটে পড়তে পারি আমরা। সেই সময়, বুঝলে, সেই সময়...'

'মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবো আমি ব্যাটার...'

'নিও,' বললো সিলভার।

ডাকাতদের কথা শুনে বুক কাঁপছে আমার। বুঝতে পারছি, এক-পেয়ে নাবিক বলতে লঙ জন সিলভারের কথাই বলেছিল বোনস। কি পরিমাণ বিপদে পড়েছি, অনুমান করে আতংকে দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হয়েছে আমার।

এই সময় আবার শোনা গেল সিলভারের কথা, 'যাক, অনেক তো কথাবার্তা হলো। এই ডিক, কয়েকটা আপেল বার করো না পিপে থেকে, খাই।'

কাঠ হয়ে গেলাম। আর রক্ষে নেই। এখুনি আমাকে খুন করে পানিতে ফেলে দেবে ডাকাতেরা। উঠে পিপে থেকে বেরিয়ে দৌড় দেবার কথা ভাবছি, এমন সময় বলে উঠলো ইসরায়েল, 'আপেল টাপেল খেয়ে এখন কাজ নেই। তারচে কিছু রাম নিয়ে এসো, মৌজ করি!'

'ঠিক আছে,' বললো সিলভার, 'এই নাও চাবি। রান্নাঘরের দেরাজে তালা দেয়া আছে। বের করে নিয়ে এসো।'

মেট অ্যারোকে কে মদ সরবরাহ করতো, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আর। হয়তো নিজের দলে তাকে টেনে নিতে পারেনি সিলভার শেষ পর্যন্ত। অ্যারোর মাতলামিকে কাজে লাগিয়েছে তখন। অন্ধকার ঝড়ের রাতে ঠেলে ফেলে দিয়েছে তাকে জাহাজ থেকে।

রাম নিয়ে এল ডিক। 'ফ্লিন্টের স্মরণে' আর 'দস্যুদের নিজেদের স্বাস্থ্য কামনা করে' মদ গিলতে লাগলো ডাকাতেরা।

পিপের ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার ছিল, এখন আলোকিত হয়ে উঠছে। খেয়াল করিনি এতক্ষণ, চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, চাঁদ উঠেছে। পিপে থেকে বেরিয়ে পালাতেও পারবো না এখন আর। তার আগেই দস্যুদের নজরে পড়ে যাবো। খুন হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

এই সময় শোনা গেল চিৎকার, 'ডাঙা, ডাঙা!'

তেরো

যুদ্ধ-আলোচনা

লাফিয়ে উঠে পড়লো ডাকাতেরা। ছুটোছুটি শুরু করে দিল। যার যার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। এই সুযোগে টুক করে বেরিয়ে এলাম পিপে থেকে। ছুটলাম জাহাজের পেছনে। ডাক্তার লিভসী আর হান্টারের দেখা পেলাম ওখানেই।

একে একে অনেকেই এসে জড়ো হলো সেখানে। ছোট্ট মেঘের আড়ালে ঢুকে গিয়েছিল চাঁদ, লুকোচুরি খেলে যেন বেরিয়ে এল আবার। দূরে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে কালো মেঘের মতো দেখা গেল দ্বীপটা।

স্বপ্নের ঘোরে আছি যেন এখনও। মাত্র দুই মিনিট আগে শোনা ডাকাতদের কথাগুলো এখনও আচ্ছন্ন করে আছে মনকে। দুঃস্বপ্নের

মাঝেই যেন শুনতে পেলাম ক্যাপ্টেন স্মলেটের গলা। জাহাজের মুখ কোন্‌দিকে ফেরাতে হবে নির্দেশ দিচ্ছেন সারেঙকে। দ্বীপের পুব দিকে নিয়ে গিয়ে জাহাজ ভেড়ানোর ইচ্ছে তাঁর।

'এর আগে দ্বীপটা দেখেছো কেউ?' উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'আমি দেখেছি,' বললো জন সিলভার। 'একটা সদাগরী জাহাজের বাবুর্চি ছিলাম তখন। নিতান্ত দুর্ঘটনার জন্যেই এই দ্বীপে জাহাজ ভেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন।'

'ম্যাপে দেখলাম, দ্বীপের পেছনে একটা উপদ্বীপে জাহাজ ভেড়ানোই নিরাপদ। জানো কিছু?'

'ঠিকই দেখেছেন। ওই উপদ্বীপটার নাম, স্কেলিটন আইল্যাণ্ড। জলদস্যুদের আড্ডা ছিল ওটা। এর উত্তরে একটা পাহাড় আছে, ফোর-মাস্ট হিল বলে ওটাকে। প্রধান দ্বীপটার এক প্রান্তে, সাগরে নেমে যাওয়া পাহাড়ের নাম স্পাই-গ্লাস। উঁচু পাহাড়, ওখান থেকে ডাকাতেরা চারদিকের সাগরের দিকে লক্ষ্য রাখতো। নামটা ওই জন্যেই হয়েছে।'

'একটা ম্যাপ আছে আমার কাছে,' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন ক্যাপ্টেন। একজন নাবিকের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেন, 'এই, একটা ল্যাম্প নিয়ে এসো তো।'

লণ্ঠনের আলোয় ম্যাপটা দেখলো সিলভার। কাছে সরে এসেছি আমি। দেখলাম, চোখ দু'টো চকচক করছে ডাকাতটার। বোনসের সিন্দুকে পাওয়া ম্যাপ নয় এটা, তবে তার অবিকল নকল। নকলটা করে দিয়েছেন নিশ্চয় জমিদার ট্রেলনী। সাংকেতিক কথাগুলো লেখা হয়নি, আর লাল কালির ক্রস চিহ্নগুলোও দেয়া হয়নি এই নকলটাতে।

জাহাজ চালাতে দরকারও নেই ওগুলোর।

'বলতো এখন,' সিলভারকে বললেন ক্যাপ্টেন, 'এই ম্যাপটা ঠিক আছে?'

'ঠিকই আছে,' ঘাড় কাত করে বললো সিলভার। শুধু আমি বুঝলাম, হতাশ হয়েছে সে। নতুন কাগজ দেখে ঠিকই বুঝেছে, বিলি বোনসের সিন্দুকে পাওয়া ম্যাপ নয় এটা। মুখে বললো, 'চমৎকার ম্যাপ। পরিষ্কার দেখানো আছে সবকিছু।' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রেখে বললো, 'এইযে, এই জায়গাটাকে ওরা বলতো ক্যাপ্টেন কিডের অ্যাংকোরেজ। দক্ষিণ ঘেঁষে বইছে প্রবল স্রোত। চলতে চলতে পশ্চিম তীরের ওদিক থেকে এগিয়েছে উত্তরে। এদিক দিয়ে এসে ভালোই করছেন ক্যাপ্টেন, দ্বীপে নামতে এদিক দিয়েই সবচেয়ে সুবিধে।'

'ধন্যবাদ। যাও এখন। দরকার হলে ডাকবো আবার,' বললেন ক্যাপ্টেন।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড সম্পর্কে সিলভারের জ্ঞান সত্যিই বিস্মিত করলো আমাকে। রান্নাঘরে ফিরে আবার আগে আমার দিকে একবার চোখ তুলে চাইলো সে। কেঁপে উঠলো আমার বুকের ভেতরটা। অথচ আমি জানি, পিপেয় লুকিয়ে থেকে ওদের কথা শুনেছি, এটা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি ডাকাতেরা। মৃদু হেসে আমার কাঁধে হাত রাখলো সিলভার। প্রায়ই এমনভাবে আমাকে আদর করে সে, আজ কিন্তু গা-টা ঘিন ঘিন করে উঠলো আমার। দারুণ ভণ্ড এই লোকটার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে গেল মন। কিন্তু তবু কাঁধের ওপর থেকে সিলভারের হাতটা সরিয়ে দিতে সাহস হলো না, আবার যদি কিছু সন্দেহ করে বসে।

'চমৎকার দ্বীপ ওটা, জিম,' বললো সিলভার, 'ঝর্ণা কিংবা সাগরের

টলটলে পানিতে গোসল করবে, বুনো ফল খাবে, ছাগল শিকার করবে, আর ছাগলের মতোই ঘুরে বেড়াবে পাহাড়-জঙ্গলে। ইস্‌স্‌, আবার যদি তোমার বয়েসে ফিরে যেতে পারতাম! অন্তত পা দু'টো ঠিক থাকলেও চলতো! হ্যাঁ, যদি দ্বীপের ভেতরে কোথাও যাও, সারা দিনের খাবার নিয়ে যেও আমার কাছ থেকে।'

অন্তরঙ্গভাবে আমার কাঁধে একটা চাপড় মেরে ক্রাচে ভর দিয়ে চলে গেল সিলভার।

জাহাজের পেছন দিকে রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচু-গলায় কথা বলছেন ট্রেলনী আর ডাক্তারচাচা। কাছেপিঠে আর কেউ নেই, সবাই চলে গেছে যার যার কাজে। এগিয়ে গেলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে সাবধানে বললাম, 'ডাক্তারচাচা, কথা আছে। ক্যাপ্টেন আর জমিদারচাচাকে নিয়ে কেবিনে যান। কোনো ছুঁতোয় আমাকে ডেকে পাঠাবেন। সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি আমরা! আমি যাই, রান্নাঘরেই থাকবো।'

মিনিট কয়েক পরেই আমার ডাক এল। কেবিনে গিয়ে দেখলাম, টেবিল ঘিরে বসে আছেন জমিদার, ডাক্তারচাচা আর ক্যাপ্টেন। টেবিলে রাখা এক বোতল স্পেনিশ মদ আর একটা পাত্রে কিছু কিস-মিস। ওগুলোর দিকে খেয়াল নেই তিনজনের কারোই। সমানে পাইপ টেনে চলেছেন ডাক্তারচাচা। পরচুলাটা খুলে রেখে বসেছেন জমিদার। পেছনে, খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে চাঁদ দেখছেন ক্যাপ্টেন।

'বলে ফেলো, জিম,' আমাকে দেখেই বললেন জমিদার।

দরজার কাছে গিয়ে বাইরেটা একবার ভাল করে দেখে এলাম। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সংক্ষেপে বললাম সব। আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করলেন না কেউ। স্থির দৃষ্টিতে

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুনে গেলেন।

আমার বলা শেষ হলে নড়েচড়ে উঠলেন ডাক্তারচাচা। বোতল থেকে মদ ঢেলে এগিয়ে দিলেন জমিদার আর ক্যাপ্টেনের দিকে। নিজেও নিলেন এক গেলাস। এক মুঠো কিসমিস তুলে বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে। নিলাম।

আমার 'স্বাস্থ্য কামনা করে' গেলাসে চুমুক দিলেন তিনজনেই। কয়েকটা কিসমিস মুখে পুরে দিলাম আমি।

'মাপ করবেন আমাকে, ক্যাপ্টেন স্মলেট,' বললেন জমিদার। 'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। আমিই আসলে গাধা। তা এখন কি করা যায় বলুন তো?'

'আমিও কম গাধা নই,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'নাবিকদের দলপতি, অথচ দলের লোক কে কেমন বুঝতে পারিনি। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি বিদ্রোহ ঘটবে জাহাজে। ইস্‌স্‌, একেবারে ছাগল বানিয়ে ছেড়েছে ওরা আমাকে!'

'অসামান্য লোক ওই জন সিলভার!' বললেন ডাক্তারচাচা, 'জলদস্যু, কিন্তু কি আশ্চর্য সংগঠন ক্ষমতা!'

'লোকটাকে সামান্যতম সন্দেহ করলাম না আমি!' বললেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু শুধু এসব আলোচনায় তো কাজ হবে না। কিছু একটা করতে হবে আমাদের, এবং শীঘ্রি।'

'আপনি জাহাজের ক্যাপ্টেন,' এতদিনে পথে এসেছেন জমিদার। 'যা ভাল বোঝেন করুন।'

'আমাদের এগিয়ে যেতে হবে,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'যেমন যাচ্ছি, ঠিক তেমনি। ডাকাতদের বুঝতে দিলে চলবে না, ওদের আসল রূপ জেনে গেছি আমরা। বোঝা যাচ্ছে, গুপ্তধন না পাওয়া পর্যন্ত আপনাদের

খুন করবে না ওরা। আমার ওপর হাত তুলবে আরও পরে। কাজেই কিছুটা সময় আমাদের হাতে আছে। তবে আগে হোক পরে হোক, ওদের সঙ্গে লাগতেই হবে আমাদের। এখানে আমরা বারোজন, এছাড়াও আরও তিনজন আছে আমাদের পক্ষে—মিস্টার ট্রেলনীর সঙ্গে যারা এসেছে আর কি। আমরা সংখ্যায় কম, কাজেই আমাদের-কেই আগে আক্রমণ চালাতে হবে।' জমিদারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে সন্দেহ নিরসন করে দিলেন ক্যাপ্টেন, 'মিস্টার ট্রেলনী, আপনার লোক তিনজনের ওপর নির্ভর করা যায়?'

'নিশ্চিন্তে,' বললেন জমিদার। তাঁর ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেনের কথার ভঙ্গি থেকেই বুঝে নিলেন।

'তাহলে ওরা তিনজন, আর আমরা এই চারজন—অবশ্য জিমকে একজন ধরলে আর কি, হলাম গিয়ে সাতজন। আক্রমণ আমরাই আগে করবো, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত চোখ রাখতে হবে ডাকাতদের ওপর। ওদের মতিগতি জানার জন্যে একজন স্পাই দরকার আমাদের। জিমই এই কাজ ভাল পারবে। চটপটে ছেলে, তাছাড়া দলের নেতা সিল-ভারের সঙ্গে তার দারুণ ভাব। পারবে তো, জিম?'

মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম।

'সাবধান, জিম!' আমাকে হুঁশিয়ার করলেন ডাক্তারচাচা, 'গুপ্ত-চরের কাজ কিন্তু সাংঘাতিক কঠিন। মারাত্মক ঝুঁকির কাজ!'

'তোমার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, জিম...' বললেন ট্রেলনী।

অস্বস্তি বোধ করছি। এত বড় বড় লোক আমার ওপর নির্ভর করছেন। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হলো। আগামী বিপদের কথা মনে করে বুক কাঁপছে। হিসপানিওলায় এখন মোট লোকের সংখ্যা ছাব্বিশ। তাদের উনিশ জনই বিদ্রোহী। এতগুলো খুনে ডাকাতের

চোদ্দ

দ্বীপে নামলাম

পরদিন খুব ভোরে উঠলাম বিছানা থেকে। উঠেই চলে এলাম ডেকে। রাতের বেলা অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছে হিসপানিওলা, দ্বীপের দক্ষিণ-পুবে নিচু তীরের প্রায় আধ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে।

ভালমতই চোখে পড়ছে এখন দ্বীপটা। বেশির ভাগই ধূসর জঙ্গলে ছাওয়া। নিচু জমিতে ইতস্তত ছড়ানো বালিয়াড়ির হলদে রঙ কিংবা বনের-মাথা-ছাড়ানো তালজাতীয় বড় বড় গাছের জন্যে এই ধূসরতা কোথাও কোথাও ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু সেটা খুব বেশি জায়গায় নয়। কেমন যেন হতাশা জাগায় মনে এই রঙ। পাথুরে পাহাড়-চূড়া বিশাল গাছেরও মাথা ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় স্পাই-গ্লাস, সিলভার ঠিকই বলেছে, সাগর-সমতল থেকে হাজার চারেক ফুট উঁচু। মাখনের চূড়া ছুরি দিয়ে কেটে সমান করার মতো যেন কেউ সমতল করে দিয়েছে খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়টার চূড়া।

তীরে আঘাত খেয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে বড় বড় ঢেউ। দুলে দুলে উঠছে হিসপানিওলা। জাহাজের এখানে-ওখানে যেখানেই কাঠের জোড়ে সামান্যতম ফাঁক আছে, কিংবা নড়বড়ে হয়ে গেছে পেরেকের গাঁথুনি, সেখানেই বিচিত্র কাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে প্রচণ্ড দুলুনিতে। ছলাৎ-ছল ছল্‌স্‌ করে ঝাপটা মারছে ঢেউ জাহাজের কাঠের খোলসে। সব মিলিয়ে একটা আজব আর্তনাদ ছড়াচ্ছে। দুলুনির চোটে মাথা ঘুরছে আমার। ডেকের রেলিঙ চেপে ধরে কোনো মতে সামলে রেখেছি নিজেকে। দুরন্ত ঢেউয়ে এমন দুলুনিতে এই প্রথম পড়েছি তো, কেমন যেন অসহ্য ঠেকছে। তার ওর খালি পেট, নাড়ি ভুঁড়িশুদ্ধ যেন বেরিয়ে আসবে এমনি মোচড় মারছে পেট।

কিন্তু তবু ডেক ছেড়ে যেতে মন চাইলো না। সূর্য উঠেছে সবে। সোনালী হয়ে উঠেছে বনের শিশির ঢাকা গাছপালার মাথায় পাতার চাঁদোয়া। পোখপাখালির কলকাকলি এত দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তবু কেন যেন বনের বিষণ্ণ ভাবটা কাটছে না। পাথুরে পাহাড়ের পাদদেশে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণি আর ফেনার সৃষ্টি করেছে নোনা পানি। কে জানে, হয়তো এই দৃশ্যই আমার মনে জলদস্যুদের চিন্তার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে, আর এই জন্যেই প্রকৃতির এমন চোখ জুড়ানো রূপও বিস্বাদ ঠেকছে আমার চোখে।

হিসপানিওলায় নতুন আরেক দিন শুরু হয়েছে। সামনে প্রচুর কাজ। বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই। মাইল তিন-চার ঘুরে খাঁড়ি ধরে গিয়ে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে নোঙর ফেলবে জাহাজ, কিন্তু তার আগেই নৌকাগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নামাতে হবে।

ক্রমেই ওপরে উঠছে সূর্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে প্রচণ্ড গরম। এই সকালেই দর দর করে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে আমার

কপাল বেয়ে।

নাবিকেরা পরিষ্কার করলো নৌকাগুলো। পুলিতে আটকানো দড়িতে বেঁধে নিচে নামালো। কয়েকজন নাবিক গিয়ে উঠলো কয়েকটা নৌকায়। আমাকে নৌকায় ওঠার আহ্বান জানালো একজন। এগিয়ে গেলাম। আমি নৌকায় নামতে না নামতেই কোথায় যেন কি একটু ভুল হলো, গালাগাল দিয়ে উঠলো অ্যাণ্ডারসন নামে এক নাবিক।

লক্ষণ খারাপ। এতদিন সবাই একটা বিশেষ নিয়মে বাঁধা ছিল, কিন্তু দ্বীপে পৌঁছতে না পৌঁছতেই কেমন যেন অধৈর্য হয়ে উঠেছে নাবিকেরা। অথচ জাহাজের গায়ে এখনও নৌকাগুলো বাঁধাই আছে।

জাহাজের হালের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জন সিলভার। বাবুর্চির কাজ নয় এটা, কিন্তু দ্বীপটা সিলভারের চেনা বলে তাকেই পথ দেখাতে আদেশ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সিলভার।

খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে জাহাজ। নিচে নৌকায় থেকেই শুনতে পেলাম সিলভারের গলা, 'ভাঁটায় টান পড়েছে। এখন তো যাচ্ছে, কিন্তু আগে কিছুতেই এখান দিয়ে ঢুকতো না জাহাজ। কোদাল দিয়ে কেটে গভীর করা হয়েছে এই পথ।'

ম্যাপে দু'টো প্রাকৃতিক বন্দর দেখানো আছে। একটা বন্দরের কাছে নিয়ে আসা হলো জাহাজ। জায়গাটার এক দিকে দ্বীপের মূল ভূখণ্ড, অন্যদিকে স্কেলিটন আইল্যাণ্ড। দু'টোই এখান থেকে সমান দূরে। কাচের মতো স্বচ্ছ এখানে পানি, তলাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। চমৎকার বালি বিছানো।

নোঙর নামানোর আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। শেকলের বিচ্ছিরি কিঁচকিঁচ শব্দে কাছের গাছপালার শাখা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়াল দিল পাখিরা। তাদের চিৎকারে শেকলের শব্দ ঢেকে গেল। নোঙর

নামানো শেষ হতেই আবার গাছে গিয়ে বসলো পাখিরা। থেমে গেল কোলাহল।

পানির কিনারে নেমে এসেছে গাছপালা। জোয়ারের পানি কতটা ওঠে, সীমানা মেপে দিয়েছে যেন। অসংখ্য সরু সরু খাল ঢুকে গেছে বনের ভেতরে।

ম্যাপে দেখানো আছে, বনের ভেতরে এদিকেই কোথাও দুর্গ আছে একটা, কিন্তু গাছপালার জন্যে চোখে পড়ছে না। কেমন যেন একটা আদিম ছাপ রয়েছে এখানকার গাছপালা-পাহাড়-জঙ্গল-সাগরে। ম্যাপটা না থাকলে ঠিক মনে করতাম, এই এলাকায় এই প্রথম মানুষের পা পড়লো।

বাতাস একেবারেই বন্ধ। কোলাহলমুখর প্রকৃতিও স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বেলাভূমিতে কিংবা পাথুরে পাহাড়ের পাদদেশে ঢেউ আছড়ে পড়া ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কেমন একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে, পাতা আর গাছের গুঁড়ি পচলে যেমন হয়।

শুধু নোঙরের ওপর ভরসা করা গেল না। তীরের একটা বড়সড় গাছের কাছে নৌকা নিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন। কাছির এক মাথা শক্ত করে গাছের সঙ্গে বেঁধে অন্য মাথা বেঁধে দেয়া হলো জাহাজের ডেক সংলগ্ন একটা মোটা খুঁটিতে। জোয়ার এলে যেন ভেসে যেতে না পারে জাহাজ এর জন্যেই এই ব্যবস্থা।

জাহাজে ফিরে এলাম আবার। ডেকের রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানছেন ডাক্তারচাচা, মুখচোখ বিকৃত। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, গুপ্তধন কি আছে না আছে ঈশ্বরই জানে, কিন্তু এখানে রোগ ছড়াবার উপকরণ আছে প্রচুর!'

নাবিকদের ব্যবহার ক্রমেই আংশকাজনক হয়ে উঠছে। যে-কোনো

সামান্য ব্যাপারেও মেজাজ দেখাচ্ছে ওরা। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মানতে চাইছে না কেউ। বিদ্রোহের চাপা আগুন জ্বলছে ভেতরে ভেতরে। যে কোনো মুহূর্তে দাউ দাউ করে বেরিয়ে আসবে লকলকে শিখা।

দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লঙ জন। এখুনি যাতে কেউ কিছু না করে বসে এই জন্যে বোঝাচ্ছে নাবিকদের। রান্নাঘরের কাজ বাদ দিয়ে ক্রাচ বগলে চরকির মতো পাক খাচ্ছে সাড়া ডেকে। চূড়ান্ত ভদ্রতা দেখাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার সহযোগিতার অন্ত নেই।

সকাল তো গেছেই, দুপুরও গেল প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনার মাঝে। এল বিকেল। প্রকট হয়ে উঠলো কেমন এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা। আমাদের চেয়েও যেন বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে জন সিলভার।

কেবিনে আমাদের সভা বসলো। আমাদের মানে, আমি, ডাক্তার-চাচা, জমিদার ট্রেলনী, ক্যাপ্টেন স্মলেট, হান্টার, জয়েস আর রেডরুথ এই সাতজন।

কি করা যায়, জমিদারের এই প্রশ্নের জবাবে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আপাততঃ কিচ্ছু করার নেই। নাবিকদের যে কোনো খারাপ ব্যবহার এখন সহ্য করতে হবে মুখ বুজে। এমনিতেই ক্ষেপে আছে ওরা, বারুদে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছোঁয়ানো যাবে না কিছুতেই। যে কোনো মুহূর্তে যা খুশি করে বসতে পারে ওরা এখন। বিদ্রোহ দমন করতে পারে এমন একটা লোকই আছে এখন জাহাজে।'

'কে সে?' জিজ্ঞেস করলেন জমিদার।

'লঙ জন সিলভার। ওই একপেয়ে লোকটাই শুধু দমন করে রাখতে পারবে নাবিকদের।'

'কিন্তু হঠাৎ এমন পাগল হয়ে উঠলো কেন ওরা?'

'ওরা ভাবছে, সারাটা দ্বীপে ছড়িয়ে আছে শুধু সোনা আর সোনা।

আসলে দ্বীপে নেমে যেতে চাইছে ওরা। কার আগে কে ধনরত্ন কুড়িয়ে নেবে এই ভাবনা। ওদেরকে এখন নামতে দেয়াই উচিত। সবাই নামবে না অবশ্যি। কিন্তু যারা নামবে তারা খালি হাতে ফিরে এলেই সবার মাথা ঠাণ্ডা হবে। কোনো ছুতো দেখিয়ে ওদের দ্বীপে নামার নির্দেশ দিই, কি বলেন, স্যার?'

জমিদার আর ডাক্তারচাচার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেনের কথাই মেনে নেয়া হলো। আমাদের সাতজনকেই এক-টা করে গুলভরা পিস্তল দিলেন ক্যাপ্টেন। মিটিঙ শেষ হলো।

ডেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন না, খানিক-ক্ষণ খামোকাই ঘুরলেন সারা ডেকে। নাবিকদের বোঝাতে চাইলেন, প্রচণ্ড গরমে অস্বস্তি বোধ করছেন। তারপর একজন নাবিককে ডাকলেন। অন্য নাবিকদেরও ডেকে ডেকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। এল সবাই। কারও মুখ গোমড়া, কেউ বা গজ গজ করতে করতে এল।

নাবিকদের উদ্দেশ্যে বললেন ক্যাপ্টেন, 'সাংঘাতিক গরম পড়েছে হে আজ। জাহাজে ভীষণ গরম। তোমরাও ক্লান্ত। এক কাজ করো, দ্বীপে নেমে বেড়িয়ে এসো খানিকক্ষণ। গাছপালার ছায়ায় অনেক ঠাণ্ডা। শোনো, সূর্য ডোবার আধঘণ্টা আগে ব্ল্যাংক ফায়ার কর-বো আমি। শব্দ শুনলেই কিন্তু চলে আসবে আবার। কি, যাবে?'

সমস্বরে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলো নাবিকেরা, আনন্দে। নিমেষে বিরক্তিভাব দুর হয়ে গেল ওদের চেহারা থেকে। পাহাড়ে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে ফিরছে উনিশজন লোকের সম্মিলিত জোরালো চিৎকার। আবার গাছের ছায়া ঢাকা ডাল ছেড়ে আকাশে উঠে গেল পাখির দল। পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে আর চেঁচাচ্ছে ওরা।

কেউ কেউ গিয়ে রেলিঙ টপকেছে, নৌকায় নামবে। ধমকে তাদের ফেরালো সিলভার। সঙ্গে সঙ্গে কেবিনে ফিরে এলেন বুদ্ধিমান ক্যাপ্টেন। নাবিকদের দলপতি সিলভার, এটা তিনি জেনেও না জানার ভান করছেন যতোটা সম্ভব। সবাই যেতে চাইছে দ্বীপে, কিন্তু বারণ করলো সিলভার। ঠিক হলো, সিলভারসহ তেরোজন যাবে, বাকি ছ'জন থেকে যাবে জাহাজে। রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে সবই দেখলাম, শুনলাম আমি।

দুর্বুদ্ধিটা মাথায় ঢুকলো এই সময়ই। সিলভার তো যাচ্ছে, আমিও যাই না কেন সঙ্গে? আড়ালে লুকিয়ে ওরা কি বলাবলি করে শুনবো? আশা করছি সিলভার আমাকে সঙ্গে নেবে।

এগিয়ে গিয়ে সিলভারকে জানালাম আমার ইচ্ছে। সানন্দেই রাজি হলো সে।

একে একে নৌকায় নেমে গেলাম সবাই। সিলভারের নৌকায় উঠলাম আমি 'সিন্দুকটা মরা মানুষের···সমস্বরে গান ধরলো ডাকাতেরা, দাঁড় বাইতে লাগলো সমান তালে। আমাদের নৌকাটা তীরের ঘাটে ছুঁতে না ছুঁতেই লাফিয়ে নেমে পড়লাম। নৌকা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো সিলভার। কিন্তু তার সমস্ত সাবধান বাণীকে অগ্রাহ্য করে ছুটে ঢুকে পড়লাম ঘন গাছপালার অরণ্যে।

পনেরো

প্রথম আঘাত

জনবসতিশূন্য দ্বীপ। জীবনে এই প্রথম অজানা অচেনা এলাকায় ঘোরার রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। পেছনে নাবিকদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে চললাম। কতগুলো গাছ দেখতে ওকের মতো, কিন্তু আসলে ওক গাছ নয় ওগুলো। পাতাগুলো অনেকটা উইলোর মতো। অজানা ফুলের গন্ধ বাতাসে। ডালে ডালে বিচিত্র রঙের, বিভিন্ন আকারের পাখি, তাদের কিচির মিচিরে মুখরিত হয়ে আছে বনের ভেতরটা। চলতে চলতে মৃদু হিস্‌স্‌ শব্দে চোখ মেলে চাইলাম। গাছের কোটর থেকে মাথা বের করে আছে একটা সাপ। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে কয়েক মুহূর্ত দেখলো সাপটা। তারপর আস্তে আস্তে আবার কোটরের ভেতর গুটিয়ে নিল নিজেকে।

হঠাৎই বেরিয়ে এলাম জঙ্গল থেকে। একখণ্ড ফাঁকা জায়গা—লম্বায় মাইল খানেক হবে, প্রস্থে সামান্য কম। চিকচিকে বালিতে ঢাকা। ওপরটায় ছোট ছোট ঢেউ খেলানো। সাগরের তলা থেকে দ্বীপটা জেগে ওঠার পর প্রথম প্রথম নিশ্চয় জোয়ারের পানি পৌঁছতো এখানে। চিকচিকে বালির ওপারে একটা পাহাড়, সাদা পাথরে ছাওয়া চূড়ায় ঝলমল করছে বিকেলের রোদ। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে উপভোগ করলাম প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ।

আবার এসে ঢুকলাম বনে। মোড় নিয়ে ফাঁকা অঞ্চলটুকুকে পাশে রেখে এগিয়ে চললাম আবার। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম নাম না জানা গাছের একটা বিশাল ঝোপের কাছে। ঝোপের নিচে মাটি নয়, বালি। হয়তো অনেক নিচে রস আছে, সেই রস টেনেই লতিয়ে উঠেছে লতাগুলো, ছোট ছোট গাছকে ঘিরে জট পাকিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ঝোপের। ঝোপটার ওপারে আরেকটা ছোট পাহাড়, টিলাই বলা উচিত। ঝোপের একপাশে, টিলার পাদদেশ ঘেঁষে একটা জলা। প্রখর রোদে হালকা বাষ্প উঠছে জলা থেকে। দেখা যাচ্ছে দূরে স্পাই-গ্লাস পাহাড়। বাষ্পের ভেতর দিয়ে দেখছি, মনে হচ্ছে কাঁপছে পাহাড়টা।

এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল, আচমকা চঞ্চলতা জাগলো ঝোপঝাড়ের ভেতর। একটা বুনো হাঁস বিচিত্র ডাক ছাড়তে ছাড়তে উড়াল দিল আকাশে। তার পেছন পেছন উড়ে গেল আরেকটা, তারপর আরেকটা। কয়েক মুহূর্তেই ঝোপের ওপরের আকাশে শুধু হাঁস আর হাঁস, পাক খেয়ে উড়ছে ওরা আর চেঁচাচ্ছে। পাখিগুলোর নিরাপদ বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে কেউ।

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। আধ মিনিট পরেই ঝোপের একপাশে জঙ্গলের ভেতরে মানুষের গলার আওয়াজ শুনলাম। নাবিকেরা আসছে নিশ্চয়। আরও কাছে এলে সিলভারের গলার স্বর চিনতে অসুবিধে হলো না। প্রকৃতি দেখতে দেখতে এতক্ষণ ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এগিয়ে গেলাম গুঁড়ি মেরে মেরে। ওদের আলোচনা শুনতেই তো এসেছি আমি।

নিঃশব্দে পা ফেলে ঝোপের এক পাশে একটা বিশাল গাছের গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। কথা শোনা যাচ্ছে কয়েক গজ সামনে। কার ওপর যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে সিলভার। ধমকাচ্ছে আর শাসাচ্ছে সে

কর্কশ গলায়। ভয় পাচ্ছি, কিন্তু তবু আস্তে করে পাতার বাধা সরিয়ে উঁকি দিলাম। দেখা যাচ্ছে না কিছু। উপুড় হয়ে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলাম আরও গজখানেক। আস্তে করে লতাপাতা সরিয়ে আবার চাইলাম ওপাশে। হ্যাঁ, দেখতে পেলাম এবার।

সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছে সিলভার। মাটিতে তার পায়ের কাছে পড়ে আছে হ্যাটটা। ঘামে ভেজা মুখটা চকচক করছে বিকেলের রোদে। তার চেহারা দেখে কেউ বলবে না, ভয়ংকর এক ডাকাত দলের সর্দার সে।

সিলভারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন নাবিক, তার নাম টম।

সিলভার বললো, 'দেখো টম, বড় বেশি কথা বলো তুমি। তোমাকে ভাল লোক মনে করতাম, তাই দলে টানতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি রাজি নও···এর অর্থ কি জানো?'

'জানি, মৃত্যু,' দৃঢ় গলায় বললো টম, 'কিন্তু তাই বলে আমাকে দিয়ে অসৎ কাজ করাতে পারবে না তুমি। তুমি কি বলো, মিস্টার ট্রেলনীর চাকরি নিয়ে এসে, তাঁর নুন খেয়ে, তাঁরই সঙ্গে বেইমানী করবো? আর যেই করুক, জন, আমি করবো না। মোহরের লোভ আমার নেই।'

এই প্রথম জানলাম, উনিশজন নাবিকের সবাই ডাকাত নয়। একজন ভাল লোককে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। ইস্‌স্‌, আগে জানলে তাকেও পিস্তল দিয়ে দিতে পারতেন জমিদার!

কি বলতে যাচ্ছিলো সিলভার, কিন্তু একটা চিৎকারে বাধা পেল। জলার ওদিক থেকে একটা দীর্ঘ আর্ত চিৎকার ভেসে এল। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুললো পাহাড়ে পাহাড়ে। নেমে এসেছিল, আবার চিৎকার করে আকাশে উঠে পড়লো পাখির দল।

কান পেতে চিৎকারটা শুনলো টম। শব্দের রেশ মিলিয়ে যেতেই

লাফিয়ে উঠলো, 'অ্যালান না তো!'

'হ্যাঁ, অ্যালানই,' হাসলো সিলভার। ক্রাচে ভর রেখে আরাম করে দাঁড়িয়েছে, 'তোমার মতোই আরেক ভালমানুষ। গেল বোধ-হয়।'

'কিন্তু সত্যিকার নাবিকের পরিচয় দিয়েছে সে। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। জাহাজে এখনও কিছু সৎ লোক আছে নিশ্চয়। তাদের হুঁশিয়ার করতে হবে। তার জন্যে যদি তোমাদের হাতে কুত্তার মতো মরতে হয় আমাকে, মরবো...' দৃঢ় পায়ে ঘুরে দাঁড়ালো টম। লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে লাগলো।

স্প্রীঙের মতোই লাফিয়ে উঠলো খোঁড়া ডাকাত। ক্রাচটা তুলে নিয়েই নিচের দিকটা সামনে বাগিয়ে ছুঁড়ে মারলো জোরে। শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে বোধ হয় ঘুরেই দাঁড়াতে যাচ্ছিলো টম, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড গতিতে গিয়ে ঘাড়ের নিচে ঠিক মেরুদণ্ডে আঘাত করলো শক্ত কাঠের ক্রাচের মাথা। কট করে বিচ্ছিরি একটা শব্দ হলো। মেরুদণ্ডটা বোধহয় ভেঙেই গেছে ওর। দড়াম করে ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো সে।

আমাকে বিমূঢ় করে দিয়ে এক পায়েই লাফাতে লাফাতে অবি-শ্বাস্য গতিতে এগিয়ে গেল সিলভার। গিয়ে বসলো টমের পিঠের ওপর। কোমর থেকে ছোরা বার করেই বসিয়ে দিল টমের পিঠে। বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, কোনো আওয়াজ বেরোলো না টমের মুখ থেকে। বিষাক্ত সাপের ফণার মতোই ছোবল হানলো ধারালো অস্ত্র। পরক্ষণেই একটানে ছোরাটা টমের পিঠ থেকে বের করে আনলো সিল-ভার। তারপর আবার বসিয়ে দিল প্রথম ক্ষতের পাশে। ছুরিটা দ্বিতীয়বার মাংস থেকে বের করে এনে টমের পিঠ থেকে উঠে পড়লো

সিলভার। সরে বসে সবুজ ঘাসে মুছে নিল ছোরার রক্তাক্ত ফলা। তারপর আবার কোমরে গুঁজলো ওটা। ক্রাচটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বগলে ঠেকালো, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে টমের পিঠ থেকে। লাল রক্তে ভিজে গেল সবুজ ঘাস।

চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠলো আমার। মিনিটের ব্যবধানে খুন হলো দু'দুজন লোক! একজনের আর্তনাদ শুনলাম, আরেকজন তো চোখের সামনেই পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছি। সম্বিত ফিরলো আমার সিলভারের হুইসেলের শব্দে।

বিচিত্র কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ সুরে বাজলো হুইসেল। ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে। প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ে পাহাড়ে। আবার উড়লো পাখিরা। ওগুলোর শান্তি নেই আজ। হুইসেল বাজিয়ে কোনো ধরনের সংকেত করছে সিলভার। কিসের সংকেত? টমকে খতম করা হয়েছে, এটা জানালো? হবে হয়তো। কিন্তু আমার আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় এখানে। যদি সিলভার বা ডাকাতদের কারও চোখে পড়ে যাই, টম আর অ্যালানের মতোই মরতে হবে আমাকেও।

হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়েই অতি ধীরে ধীরে পিছিয়ে এলাম আবার। মৃত্যুভয়ে আতংকিত হয়ে পড়েছি ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধি লোপ পায়নি। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম ঝোপের প্রান্তে। এখন সাগর তীরে পৌঁছতে হবে, কিন্তু পথ তো চিনি না। ভেবেচিন্তে খোলা জায়গাটায় যাওয়া ঠিক করলাম, ওখান থেকে যাহোক একটা ব্যবস্থা হয়তো করতে পারবো।

ছুটলাম। এমন দৌড় জীবনে দৌড়াইনি। লতায় পা জড়িয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম কয়েকবার। সারাক্ষণই

মনে হচ্ছে আমার পেছনে ছুটে আসছে ডাকাতেরা। ভয়ে পেছনে তাকাতে পারছি না। সারাদিনে এই প্রথমবার পাখিগুলোকে ধন্যবাদ দিলাম। ওদের চেঁচামেচিতে আমার পায়ের শব্দ ঢাকা পড়ে গেছে।

ছুটতে ছুটতে এসে পড়লাম ফাঁকা জায়গাটায়। হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক। গলা শুকিয়ে কাঠ। ধপ করে বসে পড়লাম বালির ওপরেই। একটু বিশ্রাম না নিলে মনে হচ্ছে বুকটা ফেটেই যাবে।

হঠাৎ শব্দ হলো পেছনে। চমকে উঠলাম। ধ্বক করে উঠলো হৃৎপিণ্ডটা। ফিরে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে থর থর করে কেঁপে উঠলাম আতংকে।

ষোলো

দ্বীপান্তরের আসামী

একটা পাইন গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে সে। বনমানুষ না ভালুক বোঝার উপায় নেই। মাথার লালচে, জট পাকানো লম্বা লম্বা চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। হাতে পায়ে বড় বড় নখ। ছাগলের ছালে ঢেকে রেখেছে শরীর। চামড়ার রঙ সাদা।

কি করবো আমি এখন? একদিকে ডাকাতের দল, অন্যদিকে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে শ্বেতাঙ্গ বনমানুষটা। সামনে পাহাড়। কোন্ দিকে যাই?

লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের দিকেই ছুটলাম। আপাততঃ জান তো বাঁচাই, তারপর পথ খুঁজে নিয়ে জাহাজে ফেরার ব্যবস্থা করবো।

কিন্তু আমি কয়েক পা যেতে না যেতেই ছুটে এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালো বনমানুষ। পরিষ্কার ইংরেজীতে বললো, 'ভয় পেও না, আমি মানুষ।'

থমকে গেলাম। এই বনমানুষটা তাহলে ইংরেজ!

'কে তুমি?'

'আমি বেন গান। হতভাগ্য এক ইংরেজ নাবিক। গত তিনটে বছর ধরে পড়ে আছি এই দ্বীপে, একা।'

'জাহাজডুবি হয়েছিল বুঝি?'

'না। আমাকে দ্বীপান্তর দিয়ে গেছে ওরা।'

এধরনের ভয়ংকর শাস্তির কথা শুনেছি আমি, জলদস্যুদের মাঝে এই প্রথা প্রচলিত। দলের কেউ মারাত্মক কোনো ভুল করে বসলে তাকে শাস্তি হিসেবে একটা নির্জন দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে যায় ডাকাতেরা। একটা বন্দুক, কিছু গুলি আর সামান্য খাবারও দিয়ে যায়। কিন্তু এতে আর ক'দিন চলে? খাবার আর গুলি ফুরিয়ে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই না খেয়ে মারা যায় নির্বাসিত লোকটি।

'তিন বছর ধরে ঝিনুক, ছাগলের মাংস আর বুনো ফলমূল খেয়ে বেঁচে আছি আমি,' আবার বললো বেন গান। 'কিন্তু ইংরেজদের সত্যিকারের যে খাবার···ইস্‌স্‌, মেট, কতদিন চোখে দেখিনি। কতদিন পনিরের জন্যে মনটা আইঢাই করেছে, কতদিন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি ঢেবিলে পনিরের স্তূপ, কিন্তু ঘুম ভেঙে যে-কে সেই। সেই আঁশটে ঝিনুক··এসব খাওয়া যায় সব সময়? শুধু বাঁচার তাগিদে গিলেছি।'

'আমি জাহাজে ফিরতে পারলে পেট পুরে পনির খাওয়াব তোমাকে,' বললাম।

'ফিরতে পারলে মানে?' রোমশ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চাইলো বেন গান।

'পথ হারিয়েছি।'

'তাহলে কোনো ভয় নেই। পুরো দ্বীপটা আমার চেনা। জঙ্গলে প্রতিটা গাছ চিনি আমি, চিনি পাহাড়ের গুহা, খানাখন্দ, ঝর্ণা। কোথায় তোমার জাহাজ?'

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ওদিকে।'

'তাহলে তো কাছেই। চলো আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আরও ব্যাপার আছে···' দ্বিধা করলাম। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'জলদস্যুরা আছে আশপাশে।'

'জলদস্যু! এই দ্বীপে আবার জলদস্যু!'

'হ্যাঁ, লঙ জন সিলভার ওদের সর্দার।'

'সেই একপেয়ে বদমাশটা না তো?'

'ঠিকই ধরেছো, সে-ই। কিন্তু তুমি চেনো ওকে?'

'চিনবো না মানে? ফ্লিন্টের দলেই তো ছিলাম আমি। সেইতো নির্বাসন দিয়েছে আমাকে এখানে।' আমার আরও কাছে এল বেন গান। মুখটা একটু নামিয়ে বললো, 'কিন্তু সর্দার তো ছিল ফ্লিন্ট! সিলভার হয় কি করে?'

'ফ্লিন্ট নাকি মারা গেছে। বেশি মদ খেতো···'

'মরবেই! কিন্তু খুশি হতে পারলাম না একথা শুনে। ফাঁসিতে ঝুলে মরা উচিত ছিল ব্যাটার। কি লাভ হলো শুধু শুধু মানুষ খুন করে? টাকা জমালি ঠিকই, কিন্তু ভোগ করতে পারলি? আমাকে

নির্বাসন দিয়েছিস, এদিকে তোর টাকার সন্ধান পেয়ে বসে আছি আমি...'

'টাকা?'

'হ্যাঁ, ফ্লিন্টের ধনরত্ন তো সব এই দ্বীপেই লুকানো...' আচমকা থেমে গেল বেন গান। সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো আমার দিকে, 'কিন্তু তোমাকে এসব বলা উচিত হচ্ছে না, সিলভারের দলের লোক তুমি।'

'না না, আমি সিলভারের দলের নই,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'ওদের ভয়েই তো পালাচ্ছিলাম। এইতো, কিছুক্ষণ আগেই দু'জন লোককে খুন করেছে সিলভার আর তার লোকেরা...' আমাদের গুপ্ত-ধনের সন্ধানে আসার ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানালাম বেন গানকে।

চুপ করে সব শুনলো বেন গান। আমার কথা শেষ হলে বললো, 'বুঝেছি, তোমাকে বলা যায়। ফ্লিন্টের জাহাজের নাম ছিল ওয়ালরাস। ওটাতে করেই সমস্ত জমানো ধনরত্ন নিয়ে এই দ্বীপে এসে হাজির হয় একদিন সে। জাহাজ নোঙর করে একটা মাত্র বোট নামানোর আদেশ দেয় ফ্লিন্ট। নৌকা নামানো হলো। সেই নৌকায় নেয়া হলো তার সমস্ত ধনরত্ন। তারপর ছয়জন বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে নৌকা ভাসালো সে। ধনরত্নগুলো নিয়ে ঢুকে গেল ওরা জঙ্গলে। কয়েক ঘন্টা পরেই নৌকা নিয়ে ফিরে এল ফ্লিন্ট, একা। আমাদের জানালো, ছ'জন অনুচর নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরেছে। ধনরত্নগুলো কোথায়, কি করেছে সে, কিচ্ছু বললো না। আমরাও সাহস করে কিছু আর জিজ্ঞেস করলাম না। হ্যাঁ, ওয়ালরাসের মেট ছিল কিন্তু বিলি বোনস ...ওই যার কথা বললে আর কি, তোমাদের সরাইতে গিয়ে উঠেছিল যে...' থামলো একটু বেন গান। তারপর একটু সামনে ঝুঁকে আমার হাত দু'টো চেপে ধরলো, 'এক কাজ করো না, মেট, আমাকে তোমা-

দের জাহাজে নিয়ে চলো। মিস্টার ট্রেলনীকে বুঝিয়ে বলো সব। ধন-রত্নের হদিস আমি দেবো, বিনিময়ে আমাকে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে দেবেন ট্রেলনী, পুলিশকে কিছু বলবেন না, আর এক হাজার পাউণ্ড দেবেন। বলবে?'

'অবশ্যই বলবো, চলো।'

বুনো ছাগলের মতোই নিঃশব্দ দ্রুত পদক্ষেপে গাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটলো বেন গান। তার পেছনে ছুটতে ছুটতে জান বেরিয়ে যাবার যোগাড় হলো আমার।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবো, এই সময় শোনা গেল কামানের গোলার আওয়াজ, তারপরেই কয়েকবার গর্জন করে উঠলো বন্দুক।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বেন গান। তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমিও। গাছের ফাঁক দিয়ে সামনে তাকালাম। কামানের গোলাটা কোন্ দিকে গেল দেখার চেষ্টা করতেই চোখে পড়লো ওটা।

বড় জোর সিকি মাইল দূরে একটা গাছের মগডালে উড়ছে একটা ফ্ল্যাগ, ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা।

সতেরো

ডাক্তার লিভসীর বিবৃতি

দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দু'টো বোট। কেবিনে বসে ক্যাপ্টেন আর ট্রেলনীর সঙ্গে কথা বলছি আমি। সকালের মতোই বাতাস স্তব্ধ। সামান্যতম হাওয়া নেই। পালে বাতাস লাগাতে পারলে জাহাজে থেকে যাওয়া ছ'জন ডাকাতকে শেষ করে এক্ষুণি নোঙর তুলে পালাতাম এখান থেকে। কিন্তু নেই বাতাস। তার ওপর হান্টারের কাছে শুনলাম, আমাদের অনুমতি না নিয়েই দ্বীপে চলে গেছে জিম হকিন্স।

আলোচনা তেমন জমছে না। প্রচণ্ড গরমে কেবিনে বসে দর দর করে ঘামছি। শেষে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। বদ্ধ বাতাসে দুর্গন্ধ যেন আরও বেশি ছড়াচ্ছে। জ্বর আর আমাশয়ে পড়ার ভয়ে শংকিত হয়ে উঠেছি।

ডেকে, একটা পালের নিচে ছায়ায় বসে আছে ছয় ডাকাত। ওদিকে ডাঙায় বোট দু'টো বেঁধে প্রতিটি বোটে একজন করে ডাকাতকে পাহারায় রেখে জঙ্গলে ঢুকে গেছে অন্যেরা। জিমকেও দেখা যাচ্ছে না। কি বোকামিই না করলো ছেলেটা! অস্বস্তিকর পরিবেশে পায়চারি করতে লাগলাম ডেকে।

এভাবে আর ভাল লাগছে না। কিছু একটা করা দরকার। মনে মনে ঠিক করলাম হান্টারকে নিয়ে বেরিয়েই পড়বো। জলিবোটটায়

করে যেতে পারবো দ্বীপে।

ক্যাপ্টেন কিংবা ট্রেলনী বাধা দিল না। জলিবোটে করে চললাম আমি আর হান্টার। আমাদের যেতে দেখে একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো দুই প্রহরী-ডাকাত। এতক্ষণ শিস দিচ্ছিলো, বন্ধ করে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো আমাদের দিকে।

ডাকাতেরা যেখানে নেমেছে, সেখানে নামলাম না আমরা। মোড় নিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেলাম। বাঁক ঘুরতেই ডাকাতদের নৌকা-দু'টোকে আর দেখা গেল না। নৌকার সামনের দিকটা তীরে ঠেকতেই লাফিয়ে নামলাম আমি। জাহাজ থেকে দু'টো পিস্তল নিয়ে এসেছি। প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। রোদের তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্যে হ্যাটের সামনের কার্নিশের তলায় একটা বড় রুমাল ঢুকিয়ে কায়দা করে কপাল ঢেকে নিলাম। এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লাম বনের ভেতর।

শ'খানেক গজ এগোতেই চোখে পড়লো দুর্গটা। একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝর্ণা বইছে। সেই ঝর্ণাটার ধারে চূড়ার কাছাকাছি একটা মজবুত কাঠের বাড়ি। চল্লিশ জন লোক সহজেই এতে থাকতে পারে। দুর্গের কাঠের দেয়ালে একটু পর পরই ফোকর, ভেতর থেকে এগুলোর মধ্যে দিয়ে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে বাইরের শত্রুদেরকে গুলি করার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এই বাড়িটার বাইরেটা ঘিরে ছ'ফুট উঁচু কাঠের গুঁড়ির দেয়াল। এতোই মজবুত, কামানের গোলার আঘাতেও যথেষ্ট কঠিন হবে ভাঙা। চমৎকার জায়গায় রীতিমত পরিকল্পনা করে তৈরি হয়েছে এই বাড়ি। এমনিতেই পাহাড়ের চূড়ায় বসা শত্রুর বন্দুকের কাছে নিচের লোকেরা অসহায়, তার ওপর ওই দুর্গ। ওটার ভেতরে থেকে ছ'জন সশস্ত্র লোক পুরো এক পল্টন সৈন্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

আমার সব চেয়ে ভাল লাগলো ঝর্ণাটা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি, এই সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। খুনের অভিজ্ঞতা নতুন নয় আমার কাছে—ডিউক অফ কাম্বারল্যাণ্ডের অধীনে কাজ করেছি, ফন্টেনয়-এ যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছি। আর্তনাদটা শুনে প্রথমেই জিমের কথা মনে হলো আমার। লুকিয়ে চুরিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে ডাকাতদের হাতে শেষ হয়ে যায়নি তো ছেলেটা!

সৈনিক কিংবা ডাক্তারের জীবনে গড়িমসির কোনো স্থান নেই। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলাম। বন থেকে বেরিয়েই এসে উঠলাম জলিবোটে। হাণ্টার বসেই আছে, আমার নির্দেশ পেয়ে সামান্যতম সময় নষ্ট না করে দাঁড় বাইতে শুরু করলো সে। জাহাজের গায়ে বোট ভিড়তেই দড়ি বেয়ে উঠে এলাম।

ক্যাপ্টেন আর স্কোয়্যার ডেকেই দাঁড়িয়ে আছে। মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা। বনের ভিতর থেকে ভেসে আসা আর্তনাদ ওরাও শুনছে। আমাকে দেখেই ছুটে এল দু'জনে। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করলো আমাকে। কিন্তু আমিও ওদের মতো চিৎকারই শুনেছি, দেখিনি কিছু।

পালের তলায় বসা ছ'জনের একজন নাবিককে ইঙ্গিতে দেখিয়ে ফিসফিস করে বললেন ক্যাপ্টেন, 'লোকটা নতুন। দেখছেন না, মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, আর কেমন উসখুস করছে?'

দেখলাম। তারপর ক্যাপ্টেন আর জমিদারকে নিয়ে কেবিনে চলে এলাম। আলোচনা করে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।

কয়েক মিনিটেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। বেরিয়ে এলাম আবার কেবিন থেকে।

কেবিনের পাশে বন্দুক হাতে পাহারায় রাখা হলো রেডরুথকে। জাহাজের পেছন দিকে জলিবোটটা এনে বাঁধলো হান্টার। তাতে জাহাজের ভাঁড়ার থেকে নিয়ে টিনের খাবার, বিস্কুট, মাংস, এক বাক্স কন্যাক মদ, ওষুধের বাক্স ইত্যাদি তুলে দিলাম। আর্মারী থেকে নিয়ে এসে তুললাম বারুদ আর বন্দুক। আমাকে সাহায্য করলো জমিদার। ডেকের সামনের দিকে রয়েছেন সশস্ত্র ক্যাপ্টেন।

জলিবোটে জিনিসপত্র তোলা শেষ হতেই ডেকে ফিরে এলাম। আমাকে দেখেই পকেট থেকে পিস্তল বের করলেন ক্যাপ্টেন। এগিয়ে গেলেন ডাকাতগুলোর দিকে। কর্কশ গলায় বললেন, 'এই হারামজাদারা, এটা কি দেখেছিস? তোদের কাণ্ডকারখানা সবই জানা হয়ে গেছে আমাদের। কাজেই হুঁশিয়ার...'

বোকা বনে গেল ছয় ডাকাতই। আমরা ওদের পরিচয় জেনে গেছি, বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন। ঘাড় ঘুরিয়ে কেবিনের দিকে তাকালো ওরা। কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসা বন্দুক হাতে রেডরুথকে দেখলো। বোঝে গেল, আটকা পড়ে গেছে। আপাততঃ করার আর কিছুই নেই ওদের।

জয়েসকে নিয়ে নৌকায় নেমে এলাম। দাঁড় বাইতে শুরু করলো হান্টার। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম প্রথমবারে যেখানে নেমেছিলাম, সেখানে। হান্টার আর জয়েসের সাহায্যে দ্রুত ডাঙায় নামালাম মালপত্র। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। এখন দলবল নিয়ে যদি এদিকে এসে পড়ে সিলভার, তাহলে সর্বনাশ হবে।

মালপত্রগুলো নিয়ে গিয়ে ছয় ফুট বেড়ার ওপর দিয়ে ভেতরে ফেলে দিলাম, মদের বাক্সটা ছাড়া, বোতলগুলো ভেঙে যাবে। জয়েসকে বন্দুক হাতে সেখানে পাহারায় রেখে আবার ফিরে এলাম জাহাজে।

আবার জিনিসপত্র বোঝাই করে নিয়ে রেখে এলাম দুর্গে। এভাবে কয়েকবার যাওয়া-আসা করে খাবার-দাবার, বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে নিয়ে গিয়ে রাখলাম দুর্গে। অস্ত্রশস্ত্র আমাদের যা দরকার নিয়ে বাকিগুলো রেলিঙ ডিঙিয়ে পানিতে ফেলে দিলাম, যেন ওগুলোকে কাজে লাগাতে না পারে ডাকাতেরা।

ভাটা শুরু হয়েছে। আর বেশি দেরি করা যাবে না। তাহলে নৌকা নিয়ে দ্বীপে পৌঁছা অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। আর মালপত্র যাবে না, এবারে যাবে লোকজন। প্রথমেই নৌকায় নামলো রেডরুথ। জমিদার নামলো তারপর। ক্যাপ্টেন নামতে যাবেন, এমন সময় লাফিয়ে উঠে ছুটে এল উসখুস করতে থাকা নাবিকটা, ওর নাম আব্রাহাম গ্রে। আক্রমণ করতে আসছে মনে করে পিস্তল তুললেন ক্যাপ্টেন।

চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা, 'দোহাই স্যার, আমাকে মারবেন না! আমি আপনাদের দলে আসতে চাই!'

ক্ষণিকের জন্যে কি ভাবলেন ক্যাপ্টেন। তারপর ডাকলেন, 'এসো, উঠে পড়ো নৌকায়! জলদি!'

আব্রাহামের পর পরই নৌকায় উঠে এলেন ক্যাপ্টেন।

পাঁচজন পূর্ণবয়স্ক লোকের ভারে টালমাটাল অবস্থা ছোট্ট নৌকার। তার ওপর আরও কিছু মালপত্র, যেমন: বারুদ, মাংস, রুটির ব্যাগ তোলা হয়েছে জলিবোটে। বার বার কাত হয়ে যাচ্ছে নৌকা, পানি উঠছে। ওদিকে ভাটা শুরু হয়েছে। পশ্চিমে বয়ে চলেছে একটা প্রবল স্রোত, তারপর চলে গেছে দক্ষিণমুখো। তারমানে নৌকার গতিপথে কোণাকুণি এসে বাধা দিচ্ছে এই স্রোত।

দাঁড় টানছে রেডরুথ আর ক্যাপ্টেন, আমি হাল ধরেছি। জোর করে নৌকার গতিপথ ঠিক রাখতে গিয়ে আধ মিনিটেই হাতের পেশীতে ব্যথা হয়ে গেল আমার। না বলে পারলাম না, 'ক্যাপ্টেন, আরেকটু জোরে টানা যায় না?'

'না,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'তাহলে বেশি দুলবে বোট, ডুবে যাবে।'

ক্রমেই গতিপথ থেকে সরে আসছে বোট, পশ্চিমে মোড় নিতে চাইছে।

'আমি কিন্তু আর পারছি না,' বলেই ফেললাম।

কি বলতে গিয়েও জাহাজের দিকে চোখ পড়ায় থেমে গেলেন ক্যাপ্টেন। চোখ কুঁচকে গেছে। বদলে গেছে গলার স্বর, 'কামান!'

জাহাজের দিকে পেছন ফিরে আছি আমি। বললাম, 'দুর্গে কামান দাগার কথা ভাবছেন তো? সেটি পারছে না ওরা কিছুতেই। অত ভারি কামান দ্বীপে আনতেই পারবে না...'

'দুর্গের কথা ভাবছি না আমি,' প্রায় ফিসফিসিয়ে কথা বললেন ক্যাপ্টেন, 'পেছনে চেয়ে দেখুন!'

চমকে উঠলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। চকিতে ঘাড় ফেরালাম। তৎপর হয়ে উঠেছে জাহাজে রয়ে যাওয়া ডাকাতেরা। ডেকে বসানো কামানের ওপরের তেরপল তুলে নিয়েছে। গোলা আর বারুদ বয়ে আনছে দু'জনে। ইস্, কেন যে কামানের গোলা-বারুদগুলো পানিতে ফেলে আসিনি!

'ইসরায়েল,' কামানের কাছে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখিয়ে বললো গ্রে, 'ফ্লিন্টের গোলন্দাজ ছিল!'

পেশীর ব্যথা অগ্রাহ্য করে জোরে হাল চেপে ধরলাম। প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগলেন ক্যাপ্টেন আর রেডরুথ। নৌকা ডুবে গেলে

নাহয় সাঁতরে দ্বীপে যাবার চেষ্টা করবো, কিন্তু তার আগেই যদি কামানের গোলা এসে পড়ে তো টুকরো টুকরো হয়ে যাবো।

কামানের পেছনে চেম্বারে গোলা ভরতে আরম্ভ করেছে ইসরায়েল।

'বন্দুকে কার নিশানা সবচেয়ে ভাল?' আমাদের জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'জমিদারের,' ট্রেলনীকে দেখিয়ে বললাম।

'ব্যাটাকে শেষ করে দিন,' ট্রেলনীকে বললেন ক্যাপ্টেন।

পায়ের কাছে রাখা বন্দুকটা তুলে নিল জমিদার। গুলি ভরাই আছে।

'তাড়াহুড়ো করবেন না,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'তাহলে নৌকা উল্টে যাবে।'

দাঁড় টানা বন্ধ করে দিলেন ক্যাপ্টেন, রেডরুথকেও বন্ধ করতে বললেন, এতে নিশানা ঠিক থাকবে ট্রেলনীর। আমি শক্ত হাতে হাল ধরে রইলাম।

ওদিকে কামানে গোলা ভরে ফেলেছে ইসরায়েল। কামানের নলের মুখ ধীরে ধীরে ঘুরছে নৌকার দিকে। গুলি করলেন ট্রেলনী। কিন্তু সজাগ লোক ইসরায়েল। জমিদারকে বন্দুক নিশানা করতে দেখেই বসে পড়লো। তার মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গিয়ে পেছনের লোকটাকে আঘাত করলো গুলি। আর্তনাদ করে পড়ে গেল লোকটা।

শুধু জাহাজ থেকেই নয়, চিৎকার উঠলো তীর থেকেও। চমকে চেয়ে দেখলাম বন থেকে বেরিয়ে এসেছে ডাকাতেরা। নৌকা দু'টোয় গিয়ে উঠছে। জাহাজের দিকে খেয়াল থাকায় এতক্ষণ সেদিকে দেখিনি।

'ক্যাপ্টেন,' চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'তীরের দিকে দেখুন!'

দেখলেন ক্যাপ্টেন। নৌকার অন্যেরাও দেখলো।

'হুঁহ্,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'মিস্টার ট্রেলনী, যে ক'টাকে পারেন, সাবাড় করে ফেলুন। দ্বীপে পৌঁছতে পারবো কিনা আর, কে জানে!'

দ্বীপের কাছাকাছি এসে গেছে আমাদের জলিবোট। আর তিরিশ-চল্লিশ বার দাঁড় টানতে হবে বড়জোর। কিন্তু এতক্ষণও টিকতে পারবো কিনা সন্দেহ। প্রচণ্ড হুঁক ছেড়ে তীর বেগে এগিয়ে আসছে ডাকাতেরা। ওদিকে আবার কামান তাক করছে ইসরায়েল।

নৌকা দু'টো লক্ষ্য করে গুলি চালালো জমিদার। দাঁড় বাইছে আবার ক্যাপ্টেন আর রেডরুথ। ধকল সইতে পারলো না আর নৌকাটা। কাত হয়েই তলিয়ে গেল পানিতে। ঠিক এই সময় গর্জে উঠলো কামান। নৌকাটা ডুবে যাওয়ায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে সামনে পানিতে পড়লো গোলাটা। ছিটকে উঠলো কাদা আর পানি। ঢেউয়ের প্রচণ্ড ঝাঁপটা খেয়ে উল্টে ডুবে গেলাম। নাকানি-চুবানি খেয়ে বেশ খানিকটা কাদাটে নোনাপানি গিলে ভেসে উঠে দেখলাম, ভিজে বেড়ালের মতো অন্যেরাও মাথা তুলছে পানি থেকে। পানির গভীরতা এখানে ফুট তিনেক। কাজেই এগিয়ে যেতে অসুবিধে হলো না আমাদের।

দু'টো বন্দুক ছাড়া নৌকার আর কোনো মালপত্রই বাঁচানো সম্ভব হলো না। সবই পানিতে ভিজে অকেজো হয়ে গেল। তীরের দিকে এগিয়ে চললাম আমরা, ভিজে কাপড়-চোপড় নিয়ে কাদা পানি ভেঙে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ওদিকে নৌকা নিয়ে আরও কাছে এসে গেছে ডাকাতেরা।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে কোনোমতে তীরে এসে উঠলাম আমরা। পেছনে তাকিয়ে

দেখলাম, একেবারে কাছে এসে গেছে ডাকাতেরা। ছুটে ঢুকে পড়লাম বনের ভেতরে।

দুর্গের দিকে ছুটেছি আমরা। পেছনে ডাকাতদের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। তীরে নামছে ওরা। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে দুর্গে পৌঁছতে পারবো কিনা, সন্দেহ। কাজেই বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। দু'টো বন্দুকের একটা গ্রে-র হাত থেকে নিলাম আমি, অন্যটা তো ট্রেলনীর হাতে আছেই।

এই সংকট-মুহূর্তে সবাই আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছি, ট্রেলনী ছাড়া। জমিদার একেবারে শান্ত। এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে তো তার। কোমর থেকে ছোরা বের করে গ্রে-এর হাতে তুলে দিল জমিদার।

ছোরাটা নিল গ্রে। ওপর দিকে ছুঁড়ে মারলো একবার। বাতাসে ডিগবাজি খেয়ে আবার নিচে পড়তে লাগলো ছোরা। ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হাতে সেটা লুফে নিল সে। বুঝলাম, ছুরি খেলায় হাত পাকা এই লোকের।

আবার ছুটতে শুরু করলাম আমরা। গাছপালার ওপাশ থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে ডাকাতেরা। এগিয়ে আসছে আরও কাছে। গাছপালার ফাঁকফোকড় দিয়ে সামনে দুর্গটাও দেখতে পাচ্ছি। বড়-জোর আর চল্লিশ কদম দুরে আছে। একবার ওতে ঢুকে যেতে পার-লেই বেঁচে যাবো।

ওদিকে বসে বসে সময় নষ্ট করেনি হান্টার, কিছু কাজ করেছে। খুঁজেপেতে দুর্গে ঢোকার প্রবেশ পথ আবিষ্কার করেছে। আমাদেরকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে দেখেই এগিয়ে এল সে। পেছনে এই সময় হৈ হৈ করতে করতে গাছপালার এপাশে বেরিয়ে এল ডাকাতেরা।

সংখ্যায় সাতজন, নেতৃত্ব দিচ্ছে জোব অ্যাণ্ডারসন।

আমরা বেড়ার কাছে চলে এসেছি, এই সময় গুলি করলো ডাকাতেরা। আমার কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। আর্তনাদ করে উঠলো রেডরুথ। পাশে চেয়ে দেখলাম, মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে হতভাগ্য লোকটা।

হাণ্টারের দেখানো পথে ছুটে ঢুকে পড়লাম দুর্গের আঙ্গিনায়, বেড়ার ভেতরে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বেড়ার ফোকরে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দিয়ে সমানে গুলি চালালাম। আমার পাশে জমিদার। ক্যাপ্টেন, হাণ্টার আর জয়েসও বন্দুক তুলে নিয়েছে। দুর্গের আশ্রয়ে থেকে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছি আমরা, বেশিক্ষণ সইতে পারলো না ডাকাতেরা। ছত্রভঙ্গ হয়ে আবার বনের ভেতরে গিয়ে গা-ঢাকা দিল।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম আমরা। তারপর বেড়ার বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি, রেডরুথের কি অবস্থা হয়েছে দেখতে হবে। রক্তে ভিজে গেছে মাটি, তার ওপর চুপচাপ পড়ে আছে বেচারা। একবার দেখেই বুঝলাম, আশা নেই। ইতিমধ্যে জমিদারও এসে বসেছে আমার পাশে। দু'জনে মিলে ধরাধরি করে মুমূর্ষু রেডরুথকে বেড়ার ভেতরে নিয়ে গেলাম।

কয়েক মিনিট পরেই মারা গেল রেডরুথ। নিঃশব্দে। যেন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

কেঁদেই ফেললো জমিদার। দীর্ঘদিন তার কাজ করে এসেছে রেডরুথ। মায়া বসে যাওয়া স্বাভাবিক।

রেডরুথের পাশ থেকে উঠে এলাম। পায়চারি করছেন ক্যাপ্টেন। এতক্ষণে খেয়াল করলাম, তাঁর পকেটগুলো যেন বেশি ফোলা।

আমাকে বার বার চাইতে দেখে একদিকের পকেট থেকে একটা ছোট সাইজের বাইবেল বের করে আনলেন ক্যাপ্টেন। রেডরুথের দিকে বাড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে কি বললেন, তারপর আবার পকেটে ভরলেন বাইবেলটা। ওদিকে রেডরুথের হ্যাটটা বেড়ার বাইরে থেকে নিয়ে এসেছে জমিদার। লাশের মুখটা ঢেকে দিল হ্যাট দিয়ে।

পকেট থেকে একে একে আরও কিছু জিনিস বের করলেন ক্যাপ্টেন। ব্রিটেনের একটা পতাকা, খুব শক্ত খানিকটা দড়ি, কালির দোয়াত, কলম, ডায়েরি আর কিছু তামাক। নিচে মাটিতে জিনিসগুলো রেখে হান্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যেই বেড়ার ভেতরে ঢোকার পথটা বন্ধ করে ফেলেছে হান্টার।

আঙ্গিনার এক জায়গায় একটা বড়সড় ফার গাছ আছে। হান্টারের সাহায্যে সেটার চূড়ার ডালপালা ছেঁটে নিলেন। তারপর নিজে গাছে উঠে খাড়া মগডালে পতাকাটা বেঁধে দিলেন। একটা প্রধান কাজ যেন সেরে এলেন এইমাত্র, এমনিভাবে হাত ঝাড়লেন ক্যাপ্টেন। তারপর আমাদের নিয়ে আসা মালপত্রের হিসেব করতে বসলেন।

হিসেবপত্র শেষ করে আরেকটা পতাকা নিয়ে রেডরুথের দিকে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। লাশের শরীর ঢেকে দিলেন পতাকা দিয়ে। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেন এভাবে ক্যাপ্টেন। লাশের পাশেই বসে আছে জমিদার, দু'চোখে পানি। হাত ধরে তাকে টেনে তুললেন ক্যাপ্টেন, সান্ত্বনা দিলেন। তারপর কাজের কথা শুরু করলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তারসাহেব, ক'দিনের মধ্যে না ফিরলে আপনাদের সন্ধানে জাহাজ আসবে ইংল্যাণ্ড থেকে?'

'আগস্টের মধ্যে,' বললাম আমি, 'ব্ল্যাণ্ডার্স আসবে।'

মাথা চুলকালেন ক্যাপ্টেন, ততদিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়!'

'মানে ?'

'গোলাবারুদ যা আছে, চলে যাবে। কিন্তু খাবার ? বড়জোর দিন দশেক চলবে এই খাবারে···'

এই সময় কামানের গর্জন শোনা গেল। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল গোলাটা। দুর্গের উদ্দেশ্যে জাহাজ থেকে কামান দাগছে ডাকাতেরা।

'চালিয়ে যাও, বাপধনেরা,' খুশি খুশি গলায় বললেন ক্যাপ্টেন, 'এভাবে গোলাই খরচ করবে শুধু, কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। চালাও, শেষ করে ফেলো গোলা···'

চমকে থেমে গেলেন ক্যাপ্টেন। হাসি মুছে গেল মুখ থেকে। দ্বিতীয় গোলাটা এসে পড়েছে বেড়ার বাইরে ! ধুলোর মেঘ উড়লো।

'ওই পতাকা,' বললো জমিদার, 'জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়। নইলে নিশানা করছে কি করে ? ওটা নামিয়ে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ···'

'পতাকা নামাবো !' প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'কিছুতেই না !' ওই পতাকাই জানিয়ে দিচ্ছে, ওদেরকে পরোয়া করি না আমরা।'

সাঁঝের অন্ধকার না নামা পর্যন্ত কামান দেগে চললো ডাকাতেরা, কিন্তু কোনো ক্ষতি করতে পারলো না আমাদের। দুর্গটা জাহাজ থেকে অনেক দূরে। অত দূর থেকে নিশানা ঠিক রাখা দুষ্কর। গোলার পর গোলা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল, কিংবা এসে পড়লো বেড়ার বাইরে এদিক-ওদিক। প্রচণ্ড অস্বস্তি আর উত্তেজনার মধ্যে রাখা ছাড়া আমাদের আর কোনো ক্ষতিই করতে পারলো না ওরা।

অন্ধকার নামতেই কামান দাগা বন্ধ হয়ে গেল। একটা প্রস্তাব

দিলেন ক্যাপ্টেন, 'ভাটার টানে পানি নেমে গেছে। ডুবে যাওয়া জলি-বোটটা নিশ্চয় পানিতে ঢেকে নেই। চলুন না, টিনের খাবারগুলো উদ্ধার করে নিয়ে আসি?'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। জাহাজ থেকে নিয়ে আসা মালপত্রগুলো ইতিমধ্যেই দুর্গের ভেতরে জায়গামত সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলেছি আমরা। কাজেই যে-কোনো দু'জন লোক দুর্গ পাহারায় থেকে অন্যেরা খাবার উদ্ধারে যেতে পারি।

তৈরি হয়ে এল গ্রে আর হান্টার। দুর্গ পাহারায় রইলো জমিদার আর জয়েস।

বন থেকে বেরিয়েই কিন্তু থমকে গেলাম আমরা। আমাদের মতোই খাবারগুলোর কথা ভেবে ফেলেছে ডাকাতেরা। সিলভারের নেতৃত্বে একটা বোট এগিয়ে আসছে জলিবোটের খাবার আর গুলি-বারুদ নিয়ে যেতে। একটা করে বন্দুক আছে সবারই হাতে। কিন্তু কোথায় পেল ওরা এই বন্দুক? আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা কয়েকটা ছাড়া তো জাহাজের আর সব বন্দুকই পানিতে ফেলে দিয়ে এসেছি!

জলিবোটের জিনিসপত্র আর আমাদের উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। এখন এগিয়ে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। ফিরে এলাম।

সবে বেড়ার ভেতরে ঢুকেছি, এমনি সময় বাইরে কার ছুটে আসা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রবেশপথটা বন্ধ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম। আমাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকলো জিম।

আঠারো

আবার জিম হকিন্সের বিবৃতি ঃ দুর্গ

'আশ্চর্য তো!' বললো বেন গান, 'জলদস্যুদের পতাকা নয় এটা। তোমার বন্ধুরা উড়িয়েছে নিশ্চয়!'

'কিন্তু···জাহাজ ছেড়ে ওখানে গেল কেন ওরা?'

'একটা দুর্গ আছে ওখানে। নিশ্চয় জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে।'

'তাহলে তো জাহাজটা দখলই করে নিয়েছে ডাকাতেরা!'

'হয় তো···'

এই সময় আবার কামান গর্জে উঠলো, থেমে গেল বেন গান। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কামানের গোলা। দুর্গের দিকে এগোতে গেলাম। হাত ধরে টেনে আমাকে থামালো বেন গান। বনের ভেতরে গাছপালার আশ্রয়ে থাকাই এখন নিরাপদ, বললো।

'···সাঁঝের পর, গোলাগুলি থামলে পর রওনা হয়েছি আবার। এসে ঢুকেছি দুর্গে। আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে পরে আসবে বলে চলে গেছে বেন গান।

দুপুরে আমি জাহাজ ছেড়ে আসার পর কি কি ঘটেছে, সংক্ষেপে জানিয়ে ডাক্তারচাচাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হিসপানিওলা দখল করেই নিল তাহলে সিলভারের লোকেরা?'

দুপুরে আমি জাহাজ থেকে চলে আসার পর কি কি ঘটেছে, আমাকেও সংক্ষেপে জানালেন ডাক্তারচাচা।

আমাদের দু'জনেরই কাহিনী পরস্পরকে জানানো হলে, উঠে দাঁড়ালাম। দুর্গের ভেতরটা দেখতে লাগলাম মশালের আলোয়। পাইনের অসমান গুঁড়ি আর কাণ্ড পর পর সাজিয়ে তৈরি হয়েছে দুর্গ। প্রাচীর পাইন কাঠের তৈরি। ঝর্ণা থেকে সরু নালা কেটে নিয়ে আসা হয়েছে ভেতরে। পাইপের সাহায্যে এই নালা থেকে একটা বিশাল লোহার গামলায় পানি আনার ব্যবস্থা আছে। ঘরের এক কোণে একটা বিশাল চ্যাপ্টা পাথর রাখা আছে। কাঠপোড়া কয়লার স্তূপ ওতে। ফায়ারপ্লেস হিসেবে পাথরটা ব্যবহার করতো ডাকাতেরা, বোঝা যাচ্ছে।

'সারা রাত বাইরেই পড়ে থাকবে নাকি রেডরুথের লাশটা?' এক সময় বললেন জমিদার, 'ওটার সৎকার করা উচিত না?' পাথরের ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে এসে দাঁড়ালাম তাঁদের কাছে।

'নিশ্চয়ই,' বললেন ডাক্তারচাচা। 'চলো যাই, কবর দিয়ে আসি তাকে।'

আঙিনার এক জায়গায় কবর খোঁড়া হলো। বালি খুঁড়তে বেগ পেতে হলো না মোটেই। লাশের মাথার দিকে ধরলেন ট্রেলনী, পায়ের দিকে হান্টার। জয়েসও সাহায্য করলো। তিনজনে মিলে ধরাধরি করে এনে কবরে নামালো লাশ। পকেট থেকে বাইবেল বের করে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পাদ্রীর কাজ সারলেন ক্যাপ্টেন।

রেডরুথের লাশ মাটি চাপা দেয়ার পরও কয়েক মিনিট কবর ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। আঙিনার বাইরের পাইন আর ফারের জঙ্গলে জমাট অন্ধকার। মুঠো মুঠো জোনাকির আলোয় অন্ধকার যেন আরও চেপে ধরেছে বনভূমিকে। নতুন কবরটার পাশে দাঁড়িয়ে কেমন যেন গা ছম ছম করে উঠলো আমার। কাঁটা দিয়ে উঠলো।

দুর্গের ভেতরে, বালির ওপর বসে মশালের আলোয় নীরবে রাতের খাওয়া শেষ করলাম আমরা।

কম্বল গায়ে দিয়ে বন্দুক হাতে দুর্গের আঙিনায় বেরিয়ে এলাম আমরা। দূরে জাহাজে ডাকাতদের উন্মত্ত-মাতাল চিৎকার এত দূরেও ভেসে এল। অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ বনভূমি।

মাঝরাত পর্যন্ত শোনা গেল দস্যুদের চেঁচামেচি। তারপর থেমে এল আস্তে আস্তে।

দুর্গের ভেতরে ঢুকলাম আবার আমরা। অনেক রাত হয়েছে। এবার ঘুমোতে হবে।

বালির ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

উনিশ

সন্ধির প্রস্তাব

উত্তেজিত কথাবার্তায় সকালে ঘুম ভাঙলো আমার। কে একজন বলে উঠলো, 'একি! এযে সিলভার!'

খোঁড়া ডাকাতটার নাম কানে যাওয়ামাত্র ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এলাম আঙিনায়। বেড়ার ফোকরে চোখ ঠেকিয়ে দেখছে আমার সঙ্গীরা সবাই। আমিও এগিয়ে গিয়ে একটা ফোকরে চোখ রাখলাম।

পেড়ার বাইরে, গাছপালার সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। একজন সিলভার, তার হাতে একটা সাদা পতাকা। দোলাচ্ছে সে পতাকাটা।

হিমেল সকাল। আর খানিকক্ষণ পরই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে আবহাওয়া, এখন সেটা ভাবাই যায় না। আকাশ উজ্জ্বল, নির্মেঘ। সূর্যের সোনালী আলো সবে গাছের ডগা ছুঁয়েছে। আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে কুয়াশা। পোখ-পাখালির কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে বনভূমি।

'কি চাই-ই!' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'শান্তি চাই আমরা,' সিলভারের কণ্ঠ শোনা গেল। 'সন্ধি করতে এসেছি!'

'ব্যাটাদের কোনো চাল!' আস্তে করে বললেন ক্যাপ্টেন। ডাক্তার-চাচাকে বললেন, 'বন্দুকে গুলি ভরে নিন। আপনি সামনের দিকটায় খেয়াল রাখুন। মিস্টার ট্রেলনী, আপনি দেখুন উত্তরটায়। জিম, তুমি চোখ রাখো পুবদিকে, গ্রে পশ্চিমে। জয়েস, হাণ্টার—তোমরা আমাদের বন্দুকে গুলি ভরে দেবার জন্যে তৈরি থাকো। সব্বাই সাবধান!' চেঁচিয়ে আবার সিলভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের এই খেয়াল কেন হলো হঠাৎ?'

'খামোকা রক্তারক্তি বারবিকিউর পছন্দ নয়!' জবাব দিল এবার সিলভারের সঙ্গী।

'তাই নাকি? বড় মজার কথা তো! কবে থেকে সাধু হলো খোঁড়াটা?'

'দয়া করে ভুল বুঝবেন না, ক্যাপ্টেন!' সিলভার বললো, 'সত্যিই কিছু কথা বলতে চাই আমি। কিছু শর্তের বিনিময়ে দু'দলে একটা বোঝাবুঝি হওয়া ভাল। কিন্তু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এত কথা কি করে

বলি ?'

কি ভাবলেন ক্যাপ্টেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, কাছে এসো। কিন্তু সাবধান, ছয়টা বন্দুকের নল চেয়ে আছে তোমাদের দিকে।'

বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালো দুই ডাকাত। ক্রাচটা বেড়া ডিঙিয়ে এপাশে ছুঁড়ে ফেললো সিলভার। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে উঁচু বেড়াটা ডিঙিয়ে চলে এল এপাশে। অন্য ডাকাতটাও বেড়া ডিঙিয়ে এসে নামলো আঙিনায়। প্রবেশপথটা অন্যপাশে। এতটা ঘুরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করলো না ওদের কেউ।

পাহারার কথা ভুলে গিয়ে গুটি গুটি পায়ে ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়ালাম। সিলভারের পরনে এখন বাবুর্চির পোশাক নেই। তার বদলে দামী পোশাক পরেছে। তামার বোতাম বসানো মোটা নীল কাপড়ের তৈরি কোটের ঝুল হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে। চমৎকার লেস লাগানো হ্যাটটা মাথার পেছন দিকে হেলানো।

'তারপর ?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'কি বলবে, বলে ফেলো চট করে।'

'বসতে বলবেন না ?' সিলভারের গলায় অনুযোগ।

'ইচ্ছে করলে বালির ওপর বসতে পারো। তোমার মতো ডাকাতের ওইই উপযুক্ত জায়গা,' নিস্পৃহ ক্যাপ্টেনের গলা।

'অঅ !'

ভেবেছিলাম বসবে না, কিন্তু ঠাণ্ডা বালির ওপরই সঙ্গীকে নিয়ে বসে পড়লো সিলভার। চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললো, 'চমৎকার জায়গা।' আমার ওপর চোখ পড়তেই হাসলো, 'আরে, জিম, তুমি এখানে !'

'কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো!' কর্কশ গলায় বললেন ক্যাপ্টেন।

সরাসরি ক্যাপ্টেনের চোখের দিকে চাইলো সিলভার। কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলো। তারপর কথা শুরু করলো, 'ক্যাপ্টেন, ফ্লিন্টের সমস্ত ধনরত্ন আমার চাই। আর আপনারা নিশ্চয় বেঁচে নিরাপদে দেশে ফিরে যাওয়াটাই সবদিক থেকে বিবেচ্য মনে করবেন। একটা ম্যাপ আছে আপনাদের '

'থাকলে?'

'ওটা দিতে হবে আমাকে।'

'বাজে বকছো,' পকেট থেকে পাইপ বের করলেন ক্যাপ্টেন। ধীরেসুস্থে তামাক পুরে ধরালেন। নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'ওটা তোমাকে দেবার জন্যে এত কষ্ট করে ট্রেজার আইল্যাণ্ডে আসেননি মিস্টার ট্রেলনী। পারলে অবশ্য ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে দেখতে পারো, কিন্তু সফল হবে না। সেটা তুমি ঠিকই বোঝো, নইলে এখানে মিন মিন করতে আসতে না।'

চুপচাপ কি ভাবলো সিলভার। হাসলো। বললো, 'আপনাকে দেখে আমারও পাইপ ধরাতে ইচ্ছে করছে।'

কোনো কথা বললেন না ক্যাপ্টেন। সিলভারকে পকেটে হাত দিতে দেখেও নীরব রইলেন। পকেট থেকে পাইপ আর তামাক বের করে ধরালো সিলভার। টানতে লাগলো। নীরবে দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে পাইপ টেনে চললো। মজার দৃশ্য!

পাইপ টানা থামিয়ে আগে কথা বললো সিলভারই, 'ক্যাপ্টেন, এ-ভাবে জেদাজেদি করে কারোই কোনো লাভ হবে না। আমার প্রস্তাব রাখছি, দেখুন পছন্দ হয় কিনা। আপনারা সমস্ত ধনরত্ন আমাকে দিয়ে দেবেন। কথা দিচ্ছি, আপনাদের নিরাপদ কোনো জায়গায় পৌঁছে দেবো

হিসপানিওলায় করে। যদি এটা পছন্দ না হয়, অন্য উপায়ও আছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত মালপত্র আমরা দু'দলের মধ্যে ভাগ করে নেবো। তারপর গুপ্তধন নিয়ে চলে যাবো আমরা। আপনারা দ্বীপেই থেকে যাবেন। কথা দিচ্ছি এবারেও, পথে প্রথম যে জাহাজটাকে দেখবো, আপনাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পাঠাবো।'

পোড়া তামাকটুকু ফেলে দিলেন ক্যাপ্টেন। পাইপের মাথার দিকটা ঠুকলেন বাঁ হাতের চেটোয়। পাইপের দিকে চেয়েই সিলভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'না।'

'তাহলে আমার প্রস্তাব শোনো এবার। পুরো নিরস্ত্র হয়ে একজন একজন করে দুর্গে আসবে তোমরা। লোহার হাতকড়া পরিয়ে বিচারের জন্যে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাবো তোমাদের। আর যদি তাতে রাজি না হও, তোমাদের শেষ লোকটাকে খুন না করা পর্যন্ত আমি, ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার স্মলেট, এই দ্বীপ ছেড়ে নড়ছি না। কোন্ ভরসায় শর্ত রাখতে এসেছো? তোমাদের আছে কি? ম্যাপ নেই, গুপ্তধন পাচ্ছো না। জাহাজ আছে, কিন্তু ক্যাপ্টেনের অভাবে দ্বীপ ছেড়ে দশ মাইল গিয়েই জাহাজ ধ্বংস হয়ে মারা পড়বে। আর ভাল যোদ্ধা, সেটাই বা বলি কি করে? পাঁচ পাঁচজনে একটি মাত্র লোক আব্রাহাম গ্রে-কে আটকাতে পারেনি। শোনো সিলভার, এরপরের বার যদি আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসো, কোনোরকম হুঁশিয়ারি ছাড়াই কপাল ফুটো করে দেবো। বোঝা গেছে? নাউ, গেট আউট।'

ভয়ংকর হয়ে উঠেছে সিলভারের চেহারা। হাসি হাসি ভাবটা অদৃশ্য হয়ে গেছে আগেই। দু'চোখে আগুনের ঝলক। বালিতে জোরে

কেঠু পাইপ থেকে জ্বলন্ত তামাকটুকু ঝেড়ে ফেললো সে। পকেটে রেখে দিল আবার পাইপ। পায়ের কাছে পড়ে থাকা ক্রাচটা তুলে নিয়ে ওটাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর থুক করে বালিতে থুথু ফেলে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আত্মসমর্পণ করছেন আপনারা। যাদের ভাগ্য ভাল, আমার হাতে ধরা পড়ার আগেই মারা যাবে!' ক্রাচে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সিলভার। সঙ্গীকে নিয়ে এগিয়ে গেল বেড়ার কাছে।

পেছন থেকে সিলভারকে ভয়ংকর এক দানবের মতো মনে হলো আমার।

বিশ

আক্রমণ

সিলভার চলে যেতেই আমাদের দিকে চোখ পড়লো ক্যাপ্টেনের। এক-মাত্র আব্রাহাম গ্রে ছাড়া কেউই নিজেদের জায়গায় নেই, সবাই চলে এসেছে সিলভার আর ক্যাপ্টেনের কথা শুনতে। ক্ষেপে আগুন হয়ে গেলেন স্মলেট।

'যার যার নিজের জায়গায় যান!' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'মিস্টার ট্রেলনী, ডাক্তার লিভসী, আপনাদের কর্তব্যজ্ঞান দেখে অবাক হচ্ছি আমি। আপনারা নাকি যোদ্ধা ছিলেন? এই ডিসিপ্লিন নিয়ে! আপনাদের দল যে হারেনি এটাই আশ্চর্য!' হাত তুলে গ্রে-কে ডাকলেন। গ্রে কাছে আসতেই বললেন, 'তোমার কথা

ডায়রীতে লিখে রাখছি আমি। দায়িত্বশীল নাবিকের মতোই কাজ করেছো তুমি। তোমার প্রমোশনের ব্যবস্থা আমি নিজে করবো। যাও, পাহারায় যাও।'

লজ্জিতভাবে মাফ চাইলেন ডাক্তারচাচা আর জমিদার ট্রেলনী। দ্রুত চলে গেলেন যার যার নিজের জায়গায়। অন্যেরাও চলে গেল।

আমি যেতে যেতে শুনলাম, বিড়বিড় করছেন ক্যাপ্টেন, 'ভীষণ কড়া কথা বলেছি সিলভারকে। ও সহ্য করবে না কিছুতেই। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই হানা দেবে ও দুর্গে, জানা কথা। সংখ্যাও বেশি। অবশ্য আমরা দুর্গের ভেতর থাকছি। তবুও···এই, এই জিম, সবাইকে ডাকো তো এখানে···'

আবার সবাইকে কেন ডাকছেন ক্যাপ্টেন, ঠিক বুঝলাম না, কিন্তু আদেশ পালন করলাম। সবাই এসে জড়ো হলে বললেন, 'যুদ্ধ আসন্ন। কিন্তু খাওয়াই হয়নি এখনও। আগে কিছু খেয়ে নেয়া যাক। তারপর নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। ওরা আসবেই···'

দুর্গের ভেতরে এসে ঢুকলাম সবাই। খাবার তৈরি করে পরিবেশনের ভারটা পড়লো আমার ওপর।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল সবাই। গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বললেন ক্যাপ্টেন, 'ডাক্তার লিভসী, দুর্গের দরজা পাহারা দেবেন আপনি। আড়ালে থাকবেন, যেন কিছুতেই ডাকাতেরা আপনাকে দেখে না ফেলে। হান্টার, পুবের ভার নেবে তুমি। জয়েস, তুমি থাকবে পশ্চিমে। মিস্টার ট্রেলনী, আপনার নিশানা সবচে ভাল। গ্রে-ও ভালোই যুদ্ধ করতে পারবে, বুঝে নিয়েছি আমি। আপনারা দু'জনে সামলাবেন উত্তর দিকটা। বিপদ ওদিকেই বেশি। জিম, তুমি কেবল খালি হয়ে যাওয়া বন্দুকে গুলি ভরবে। তোমাকে আমিও সাহায্য করবো। বুঝে-

ছেন সবাই ?'

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো সবাই।

ঠাণ্ডা কেটে গেছে। প্রচণ্ড গরম পড়তে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। গাছপালার মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্য। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বালি। দুর্গের কাঠের রজন গলতে শুরু করেছে রোদ পড়ে। জ্যাকেট খুলে ফেলেছি আগেই। শার্টের হাতা গুটিয়ে নিলাম।

যার যার জায়গায় পাহারায় নিযুক্ত হলো যোদ্ধারা। বন্দুক আর গুলি-বারুদ জড়ো করে গুলি ভরতে লাগলাম। আমাকে সাহায্য করছেন ক্যাপ্টেন। একেকটা বন্দুকে গুলি ভরা হতেই নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিলাম একেকজন যোদ্ধার হাতে।

কেটে গেল এক ঘণ্টা।

কথা রাখলো সিলভার। ঠিক একঘণ্টা পর গর্জে উঠলো কামান। আওয়াজটা মিলিয়ে যেতেই নিজের জায়গায় থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো জয়েস, 'ক্যাপ্টেন, ডাকাতদের দেখামাত্রই গুলি করবো ?'

'অবশ্যই !'

কিন্তু গুলি করার মতো কাউকেই দেখা গেল না।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। সবাই সতর্ক আমরা। কেটে যাচ্ছে সময়। হঠাৎই গুলি করে বসলো জয়েস। সঙ্গে সঙ্গেই বনের ওদিক থেকে পর পর কয়েকবার গর্জে উঠলো বন্দুক। তারপরই শুরু হলো একটানা গুলিবর্ষণ। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, সব দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে গুলি। বিঁধছে কাঠের দেয়ালে। কিন্তু একটা গুলিও কাঠ ভেদ করে দুর্গে ঢুকতে পারছে না। আধ মিনিট পরে হঠাৎই আবার থেমে গেল গুলির আওয়াজ।

'কাউকে লাগাতে পেরেছো ?' জয়েসকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন ?

'মনে হয় না।'

'আপনার ওদিকে ক'জনকে দেখেছেন, ডাক্তারসাহেব?'

'তিনটে বন্দুক গর্জেছে।'

'আপনার?' ট্রেলনীকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'সাতটা হবে, ঠিক বলতে পারছি না।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পুব আর পশ্চিম থেকে মাত্র একটা গুলি এসেছে। ক্যাপ্টেনের অনুমানই ঠিক। উত্তর থেকেই আসবে আসলে আক্রমণ। অন্য তিন দিকে দু'য়েকজন করে রয়েছে শুধু আমাদের ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে।

আবার সব চুপচাপ। তারপর হঠাৎই শোনা গেল একটা হুল্লোড়। উত্তরের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুর্গের দিকে ছুটে আসছে একদল ডাকাত। ছুটতে ছুটতেই গুলি চালাচ্ছে।

সমানে গুলি চালাচ্ছেন ট্রেলনী আর গ্রে। ফোকরে চোখ রেখে দেখলাম, তিনজন ডাকাত পড়ে গেল। কতটা আহত হয়েছে, দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে মরেনি কেউই। কারণ, নিজেদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আবার গাছপালার আড়ালে চলে গেল তিনজনেই।

মুহুর্মুহু গুলিবৃষ্টি অগ্রাহ্য করে বেড়ার কাছে চলে এল ডাকাতেরা। ফোকরের ভেতর দিয়ে পুরো একশো আশি ডিগ্রী ঘোরানো যায় না বন্দুকের নল। কাজেই নলের মুখ আর এখন ডাকাতদের দিকে নিশানা করতে পারছে না। সোজা ধেয়ে এল ওরা বেড়ার কাছে। নেতা জোব অ্যাণ্ডারসন।

এক পাশে দাঁড়িয়ে ফোকরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে থাকা হাণ্টারের বন্দুকের নল ধরে ফেললো এক ডাকাত, জোরে ঝাঁকুনি দিয়েই পিছনে ধাক্কা মারলো। চোয়ালে বন্দুকের বাঁটের প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে পেছনে

উল্টে পড়লো হান্টার। জ্ঞান হারিয়েছে আগেই। ফোকর গলিয়ে বন্দুকটা বের করে নিল ডাকাত।

ওদিকে বেড়া ডিঙোতে শুরু করেছে কয়েকজন ডাকাত। ধপ করে লাফিয়ে নেমে খোলা ছুরি হাতে ডাক্তারচাচাকে আক্রমণ করলো একজন।

উল্টে গেছে পরিস্থিতি। আমাদের কায়দা করে ফেলেছে ডাকাতেরা। চিৎকার, হুল্লোড়, পিস্তল-বন্দুকের আওয়াজ ছাপিয়ে একটা আর্তস্বর শোনা গেল। একটা ছুরি নিয়ে ছুটে গেলাম শব্দ লক্ষ্য করে।

ফাঁকা জায়গায় ছুরি হাতে লড়ছেন ডাক্তারচাচা। আক্রমণকারী দস্যুর গালের একদিকে ছুরির আঘাতে কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। আমি কাছে যাবার আগেই আবার ছুরি চালালেন ডাক্তারচাচা। ফেরাতে গিয়ে বাহুতে আঘাত খেলো ডাকাত। বুঝে গেল, ডাক্তারচাচার সঙ্গে পেরে উঠবে না। ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল ডাকাতটা, তারপর ঘুরেই ছুটলো ঢাল বেয়ে। তাড়া করে ধেয়ে গেলেন ডাক্তারচাচা।

'দুর্গের পেছনে যান সবাই,' ক্যাপ্টেনের উত্তেজিত আদেশ শুনতে পেলাম।

ডাক্তারচাচার পেছনে ছুটতে গিয়েও থমকে গেলাম। মোড় নিয়ে ঘুরে ছুটলাম দুর্গের পেছনে। কিন্তু কয়েক গজ এগিয়েই একেবারে অ্যাণ্ডারসনের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। ছুরিটা বাগিয়ে ধরে আমার দিকে তেড়ে এল অ্যাণ্ডারসন। ছুরির আঘাত বাঁচাতে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলাম। কিন্তু কিসে যেন পা বেধে গিয়ে পড়ে গেলাম উল্টে। ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করলো আমার দেহ। এতে ভালোই হলো। আমাকে ছেড়ে গ্রে-কে আক্রমণ করলো সে।

ছুরি খেলায় অ্যাণ্ডারসনের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ গ্রে। সহজ-ভাবে অ্যাণ্ডারসনের আঘাত প্রতিহত করে পাল্টা আঘাত হানলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অ্যাণ্ডারসনের হাত আর গাল বেয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করলো।

ওদিকে একজোট হয়ে ডাকাতদের আক্রমণ করেছেন ডাক্তারচাচা, জমিদার আর জয়েস, হুগের পেছনে সবাই। বেড়ার ধারে মাটিতে বসে দেখছি। অল্পক্ষণেই পিছু হটতে আরম্ভ করলো ডাকাতেরা। এদিকে অ্যাণ্ডারসনকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে গ্রে।

উঠে পড়লাম। ছুরিটা পড়ে গেছে হাত থেকে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ডাক্তারচাচার কাছে ছুটলাম। তেমন কিছুই করতে পারবো না জানি, কিন্তু তবু যদি কিছু সাহায্য করতে পারি? কিন্তু তার দরকার হলো না। রণে ভঙ্গ দিয়ে বেড়ার দিকে ছুটেছে ডাকাতেরা। ইতি-মধ্যেই বেড়া ডিঙোতে শুরু করেছে অ্যাণ্ডারসন। আর পাঁচ সেকেণ্ড পর একজন জ্যান্ত ডাকাতও রইলো না বেড়ার এপাশে।

ডাকাতরা পালিয়ে যেতেই লোকজন কতটা কি ক্ষতি হয়েছে জানা গেল। বেড়ার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এখনও হান্টার। জয়েসের কাছে মুখ গোমড়া করে বসে আছেন জমিদারচাচা। এগিয়ে গেলাম। ডাক্তারচাচা বসে পড়ে জয়েসকে একবার পরীক্ষা করলেন। তারপর হতাশভাবে মাথা নাড়লেন এদিক-ওদিক, 'সব সাহায্যের বাইরে চেলে গেছে!'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন জমিদার ট্রেলনী। চব্বিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি, এরই মাঝে দু'দুজন বিশ্বস্ত অনুচরকে হারালেন চিরকালের মতো।

সামান্য আহত হয়েছেন ক্যাপ্টেন। গুলি খেয়েছেন কাঁধের কাছে। তেমন কিছু না। ডাক্তারচাচা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তিনিও আহত

হয়েছেন। ছুরির আঘাত। হান্টারেরও জ্ঞান ফেরানো হলো। আমার কব্জি থেকেও রক্ত ঝরছে, এতক্ষণ পরে খেয়াল করলাম।

ডাকাতেরা ক'জন মারা পড়েছে, গুণলাম এবার। বেড়ার ভেতরে আর বাইরে পড়ে থাকতে দেখলাম পাঁচটা লাশ, সবই ডাকাতদের।

একুশ

আবার সাগরে

বেলা বারোটা নাগাদ লাশগুলোকে কবর দেয়া শেষ করলাম আমরা। তারপর লাঞ্চ সেরে নিলাম। খাওয়ার পর জমিদার ট্রেলনীর সঙ্গে কি পরামর্শ করে একটা বন্দুক, দু'টো পিস্তল, একটা ছুরি আর ম্যাপটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ডাক্তারচাচা। বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকটা একবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিলেন। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকে পড়লেন পাহাড়ের গোড়ার জঙ্গলে।

আঙিনায় বসে সবই দেখলাম আমি আর আব্রাহাম গ্রে। কোথায় গেলেন ডাক্তারচাচা, ভেবে অবাক লাগলো! দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা সরিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো গ্রে, 'গেলেন কোথায় ডাক্তার-সাহেব?'

'কোনো মতলব আছে নিশ্চয়!' বললাম আমি, 'বেন গানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কিনা, কে জানে!'

তীব্র কিরণ ছড়াচ্ছে সূর্য। তেতে উঠেছে বালি। আর বসা যাচ্ছে

না আঙিনায়। দুর্গের ভেতরে ছাড়া ছায়া নেই। না না আছে, বনের ভেতর গাছপালার ছায়া আছে। ঠাণ্ডাও বেশ ওখানে। এই সময়ই ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়। তাইতো! ডাক্তারচাচার পিছু পিছু গেলে মন্দ হয় না! সূর্যের আঁচ থেকে বাঁচতে পারবো, কৌতূহলেরও অবসান হবে। পেট ভরাই আছে। দু'টো পিস্তল আর কিছু বিস্কুট পকেটে ভরে নিলাম। তারপর বেরিয়ে এলাম বেড়ার বাইরে। সোজা ছুটে ঢুকে পড়লাম জঙ্গলে, ডাক্তারচাচা যেখান দিয়ে ঢুকেছেন।

ডাক্তারচাচাকে দেখলাম না। ঘন জঙ্গলের কোথায় হারিয়ে গেছেন, কে জানে! এদিক-ওদিক খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু বৃথা। দুর্গে ফিরে যেতে মন চাইছে না। একবার সাগরের দিক থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছে চাপলো মনে।

গাছপালার ভেতর দিয়ে, ঝোপঝাড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছি। গাছে গাছে গান গাইছে পাখিরা, ঝোপের ভেতরে পোকা-মাকড়ের ডাক, পাইনের মিষ্টি গন্ধ, শীতল ছায়া আর বুনো ফুলের চোখ ধাঁধানো রূপ উপভোগ করছি সারাক্ষণ। চলেছি দ্বীপের দক্ষিণ ধারে, ডাক্তারচাচাকে যখন পেলামই না অন্তরীপ পর্যন্ত ঘুরেই আসি।

সামনে সাগরের গর্জন শোনা যাচ্ছে। বাতাস বইতে শুরু করলো হঠাৎই। এমনিতেই শীতল ছায়ার ভেতর দিয়ে চলেছি, তার ওপর বাতাসে জুড়িয়ে গেল শরীর। সাগরের নোনা গন্ধ মেশানো বাতাস জোরে জোরে টেনে নিলাম ফুসফুসে। একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠলো শরীর। একটুও ক্লান্তি অনুভব করছি না।

আরও খানিকটা যেতেই গাছপালার ভেতর দিয়ে চোখে পড়লো ঢেউ খেলানো নীল সাগর। সাদা ফেনায় ঝিলমিল করছে দুপুরের রোদ। এখানকার সাগরের সুন্দর রূপ এই প্রথম দেখলাম। জোর

বাতাসে বিশাল সব ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরভূমিতে। ছল-ছলাৎ শব্দে ফিরে যাচ্ছে আবার ঢেউ, ভেজা বালিতে রেখে যাচ্ছে নোনা ফেনা। অপূর্ব!

আনন্দে শিস দিতে দিতে সাগরের ধার ধরে এগিয়ে চলেছি। অনেকখানি দক্ষিণে গিয়ে বাঁক নিয়েছে তীরভূমি। আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। সাগর এখন আমার পেছনে। সামনে সম্ভবত স্কেলিটন আইল্যাণ্ড—কংকাল দ্বীপ।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম আবার। এতটা তাড়াতাড়ি শেষ হবে জঙ্গল, ভাবিনি। আরে, এ কোথায় এলাম! সামনেই তো নোঙর করে আছে হিসপানিওলা। সারাক্ষণ একই জায়গায় ঘুরেছি। অথচ আমি ভেবেছি বুঝিবা কতটা পথ পেছনে ফেলে একেবারে দক্ষিণে চলে এসেছি।

হিসপানিওলার মাস্তুলে পতাকা রয়েছে এখনও, তবে ব্রিটেনের পরিবর্তে জলদস্যুদের জলিরোজার ফ্ল্যাগ। জাহাজের দু'পাশে বেঁধে রাখা হয়েছে নৌকা দু'টো। ডেকের ওপর রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিলভার। লাল-টুপি পরা একটা ডাকাতের সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে দু'জনেই। লাল-টুপির পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরও একজন। খানিকক্ষণ কথা বলে পাশের লোকটাকে নিয়ে একটা নৌকায় নামলো লাল-টুপি। বাঁধন খুলে দাঁড় বাইতে লাগলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে অন্তরীপের দিকে। হ্যাঁ, এইবার অন্তরীপ কোথায় মনে পড়ে গেছে, আর ভুল হবে না। নৌকাটাকে অনুসরণ করার জন্যে আবার বনের ভেতর ঢুকে পড়ে এগিয়ে চললাম।

কতক্ষণ হেঁটেছি, বলতে পারবো না। বেরিয়ে এলাম আবার খোলা জায়গায়। স্পাই-গ্লাস পাহাড় দেখা যাচ্ছে। অবাক হয়েই

দেখলাম, পাহাড়ের দিকে হেলে পড়েছে সূর্য। পাদদেশের জঙ্গলের মাথায় হালকা ধোঁয়ার মত কুয়াশা জমছে। লাল-টুপির নৌকাটাকেও হারিয়ে ফেলেছি, দেখতে পাচ্ছি না আর। ওদিকে সাঁঝ হতে আর বেশি দেরি নেই। রাতের অন্ধকার নামলে ডাকাতের নৌকার দেখা পাওয়া তো দূরের কথা দুর্গে ফেরাই মুশকিল হবে। কিন্তু দুর্গটা কোথায়? আঁতকে উঠে উপলব্ধি করলাম, পথ হারিয়ে ফেলেছি।

সাগরের তীর ধরে এগিয়ে চললাম। ইচ্ছে, হাঁটতেই থাকবো। এক সময় না একসময় দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছুবোই। দূর থেকে পতাকাটা দেখতে পেলে আর অসুবিধে হবে না।

ফার্লংখানেক পেরোতেই একটা প্রকাণ্ড সাদা মতো পাথরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এটাকে এর আগে কখনও দেখিনি। আসলে এর আগে কখনও এদিকে আসিইনি, দেখবো কি করে? এগিয়ে গিয়ে পাথরের রুক্ষ গায়ে হাত বোলালাম। সাঁঝ হয়ে এসেছে। তবে অন্ধকার নামতে কিছুটা দেরি আছে। ধূসর আলোয় পাথরের নিচের ছোট গুহাটা নজরে পড়লো। ঘাস আর লতাপাতায় ঢাকা গুহামুখের চারদিকটা। ভেতরে কি আছে? সাপখোপ? কে জানে কোনো ধরনের হিংস্র জানোয়ারও থাকতে পারে এখানে। উবু হয়ে বসে পড়লাম। উঁকি দিলাম ভেতরে। কালো মতো কি জানি দেখা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হলো। ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। গজখানেক এগিয়েই বুঝে ফেললাম, কালো জিনিসটা কি। একটা তাঁবু। ছাগলের চামড়ায় তৈরি। ব্রিটেনের জিপসীরা এই ধরনের তাঁবুতেই রাত কাটায়।

তাঁবুটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোনো দরজা বা ঢোকার পথ নেই। বসে পড়ে একটা ধার ধরে টান দিলাম। উঠে গেল ওপরের

দিকে। ও, কাঠামোটার ওপর কায়দা করে চামড়া বসিয়ে দেয়া হয়েছে শুধু। কেউ নেই। বেন গানের ছাড়া আর কারও তাঁবু নয় এটা, অনুমান করে নিতে অসুবিধে হলো না! তাঁবুর ভেতরে একটা ছোট নৌকা রাখা আছে। ছাগলের চামড়ায়ই তৈরি। ব্রিটেনের অধিবাসীরা চামড়া দিয়ে এমন নৌকা বানায়। এদেরকে ওরা বলে 'কোরাক্‌ল্'। হালকা জিনিস, সহজেই বহন করা যায়। হালকা কাঠের তৈরি একটা দাঁড়ও পড়ে আছে নৌকার পাশে।

নৌকাটা দেখে নতুন এক মতলব এল আমার মাথায়। এতে চড়ে হিসপানিওলায় চলে গেলে হয়তো ডাকাতদের আগামী পরিকল্পনা লুকিয়ে চুরিয়ে শুনে ফেলতে পারি।

আঁধার নামছে বাইরে। বসে পড়ে বিস্কুটগুলো খেয়ে নিলাম। পিস্তল দু'টো একবার পরীক্ষা করে নিয়ে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। তারপর নৌকাটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম গুহার বাইরে।

যে পথে এসেছি, সেই পথেই হাঁটা শুরু করলাম। সাগরের ধার ধরে হাঁটছি, কাজেই হিসপানিওলা কোথায় নোঙর করা আছে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়। অগত্যা যদি নাই পারি, নৌকা ভাসিয়ে তীর ধরে বেয়ে যাবো। একসময় না একসময় জাহাজটা দেখতে পাবোই। তাছাড়া রাতের বেলা আলো জ্বলবে জাহাজে, দূর থেকেও চোখে পড়বে এই আলো। আর হিসপানিওলাকে একবার খুঁজে পেলে দুর্গটা খুঁজে পাওয়াও সহজ হবে।

হালকা হলেও কতোই বা হালকা হবে একটা নৌকা। তার ওপর একটা দাঁড়ও সঙ্গে আছে। বেশিক্ষণ বয়ে নেয়া সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। অগত্যা পানিতে ভাসিয়ে তীর ধরে বেয়ে চলাই ঠিক মনে করলাম। ভাটাও শুরু হয়ে গেছে। কাদা পানি ভেঙে একটু বেশি

পানিতে নিয়ে গিয়ে নৌকা ভাসালাম। নৌকায় চড়েই টের পেলাম এই জিনিস সামলানো বড় কঠিন।

দাঁড় বেয়ে চলেছি। কিন্তু পথ আর ফুরায়ই না। কতক্ষণ চলেছি জানি না, অন্ধকারে হিসপানিওলাকে প্রায় এড়িয়েই চলে যাচ্ছিলাম। আলো জ্বালেনি জাহাজে ডাকাতেরা। অন্ধকারে আবছা কালো এক বিশাল দানবের মতো হিসপানিওলার অবয়ব হঠাৎই ফুটে উঠলো চোখের সামনে। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

নৌকা ঠেকালাম জাহাজের গায়ে। জাহাজের কোথায় নৌকা বাঁধতে হয় জানি। কোরাকলটাকে বাঁধতে গিয়েই খেয়াল হলো আমার, বোট নেই। কে জানে, ওদিকে বাঁধা আছে হয়তো। কিন্তু তাতো নিয়ম নয়!

কোরাকলটাকে বেঁধে দাঁড়টাকে ফেললাম নৌকার খোলে। দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে যাবো এই সময় উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল ডেক থকে। চমকে উঠলাম। গলাটা ইসরায়েলের। কার সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছে সে। দ্বিতীয় লোকটার কর্কশ কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। ক্রমেই বাড়ছে চেঁচামেচি। একটা ব্যাপারে অবাক লাগলো, মাত্র দু'জন লোকের গলাই শোনা যাচ্ছে, তৃতীয় আর কেউই নেই। বাতিও নেই জাহাজে। ব্যাপারটা কি?

হঠাৎই শোনা গেল ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘর্ষণের শব্দ। আঁতকে উঠলাম। এই শব্দ আমার চেনা। ছুরির সঙ্গে ছুরি ঘষা খেয়েছে। সেই সঙ্গে চললো তুমুল গালাগালি। জড়িত কণ্ঠস্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছে, দু'জনেই মাতাল। আচমকা আর্তনাদ করে উঠলো একজন। তীক্ষ্ণ, লম্বিত আর্তকণ্ঠ। ধপ করে একটা আওয়াজ হলো, ময়দার বস্তা কাঠের ডেকে গড়িয়ে পড়লে যেমন হয়। তারপরেই সব চুপ। খুন

হয়ে গেল নাকি একজন লোক ?

আর দ্বিধা না করে তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। রেলিঙ ধরে তীক্ষ্ণ চোখে ডেকের দিকে তাকালাম। অন্ধকারে আবছা মতো দেখা গেল চিত হয়ে ডেকের ওপর পড়ে আছে একজন লোক। আরেকজন বসে কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে। তার হাঁপানির শব্দও শুনতে পাচ্ছি পরিষ্কার। ইসরায়েল হ্যাণ্ডস বেঁচেই আছে।

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করলাম। অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি জাহাজে আর কোনো লোক নেই। ডেকে পড়ে আছে একটা ডাকাতের লাশ, জীবিত বলতে ইসরায়েল হ্যাণ্ডস আর আমিই আছি এখন জাহাজে। অন্য লোকগুলো কোথায় গেল ? বোট নেই। তারমানে এই দু'জনকে পাহারায় রেখে দলবল নিয়ে দ্বীপে চলে গেছে সিলভার।

নিঃশব্দে রেলিঙ টপকালাম। তারপর নিঃশব্দেই হেঁটে এসে দাঁড়ালাম ইসরায়েলের পেছনে। মৃদু কণ্ঠে বললাম, 'যেখানে আছো বসে থাকো, ইসরায়েল, নইলে খুলি উড়ে যাবে !'

'কে ?' আঁতকে উঠে ঘাড় ফেরালো ইসরায়েল। অন্ধকারে আমাকে চিনতে একটু সময় নিল। ফিসফিস করে বললো, 'জিম না ?'

'হ্যাঁ, আমি জিমই। জাহাজে আর কে আছে ?'

'আর কেউ নেই। জিম, আমি আহত। প্লীজ, একটা বাতি ধরাও। একটু রাম আনবে···'

পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে কেবিনে ঢুকলাম। বাতি আর দিয়াশলাই কোথায় আছে, জানি আমি। অন্ধকারেই দু'টো জিনিস খুঁজতে গিয়ে কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকলো। যে জিনিসটা যেখানে থাকার কথা, নেই। তবে ওয়াল কেবিনেটের ড্রয়ারে দিয়াশলাই খুঁজে পেলাম। একটা কাঠি জ্বালতেই কেবিনের ভেতরটা দেখতে পেলাম। তছনছ

লণ্ডভণ্ড করে রাখা হয়েছে পুরো ঘরটা। তন্নতন্ন করে কিছু খোঁজা হয়েছে। বোধহয় ম্যাপটাই খুঁজেছে সিলভার।

লণ্ঠন নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এলাম আবার। তেমনিভাবে বসে আছে ইসরায়েল। সারা গায়ে রক্তের চিহ্ন। গাল আর কপালের চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। হাতেও রক্ত। ডান উরু থেকে নিচের দিকটা রক্তে ভিজে গেছে।

'জিম,' বললো ইসরায়েল, 'ডান পা-টা বোধ হয় ভেঙ্গেই গেছে! আহ্! একটু রাম এনে দেবে আমাকে?'

ইসরায়েলের হাতখানেক দূরে পড়ে থাকা লাশটার দিকে তাকালাম। বুকে আমূল বিঁধে আছে একটা বড় ছোরা। গত কয়েকদিনে এত খুনোখুনি দেখেছি, এই লাশটা দেখে তেমন প্রতিক্রিয়া হলো না আমার। লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ভাঁড়ারের দিকে চললাম। পুরো জাহাজটাকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে ডাকাতেরা। প্রচণ্ড এক ঝড় বয়ে গেছে যেন ছিমছাম হিসপানিওলার ওপর দিয়ে।

মদ এনে দিলাম ইসরায়েলের হাতে। এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ফেললো সে। তারপর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে আমার অনেক গুণগান করলো। কিন্তু তাতে মজলাম না আমি। ইসরায়েলকে উঠে দাঁড়াতে বললাম। কিন্তু পা ভেঙে যাবার দোহাই দিয়ে উঠলো না সে। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না। সন্দেহ হচ্ছে আমার। পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে তাক করলাম। 'ওই কেবিনে চলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছেঁচড়েই চলো!'

পিস্তলটার দিকে একবার তাকালো ইসরায়েল। তারপর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নড়লো। দেহটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো কেবিনে। খুঁজেপেতে একটা তালা এনে দরজা বন্ধ করলাম। রাতটা কেবিনেই

কাটাক ইসরায়েল, সকালে দেখা যাবে কি করা যায়। এই সময় আর দুর্গে ফিরতে ইচ্ছে হলো না আমার। তাছাড়া অন্ধকারে পতাকাটা দেখা যাচ্ছে না, খুঁজে পাবো না দুর্গটা। জাহাজেই রাত কাটানো স্থির করলাম। সিলভার ফিরে এলে দূরে থেকেই তার নৌকা দেখতে পাবো। লুকিয়ে পড়তে পারবো তখন কোথাও। কাজেই একটা গদি এনে কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম। সারাটা দিন ভয়ানক পরিশ্রম করেছি। আরাম পেয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। ঘুমে জড়িয়ে আসছে দু'চোখ।

চোখেমুখে রোদের ছটা লাগতে ঘুম ভাঙলো। ধরমড়িয়ে উঠে বসলাম। রাতের বেলা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। না, সিলভার ফিরে আসেনি। তাহলে এত বেলা পর্যন্ত এভাবে ঘুমোতে পারতাম না।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাহাড়টাকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একি? এত স্পাই-গ্লাস পাহাড় নয়! আশপাশের বন আর তীরভূমিও কেমন যেন অচেনা। পাহাড়টা একটা অন্তরীপের ওপারে। গাছপালা তেমন নেই পাহাড়ে। চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু উঁচু বড় বড় পাথরে ছাওয়া অন্তরীপ। জাহাজ থেকে তীর বড়জোর সিকিমাইল দূরে। কিন্তু এখানে কে আনলো জাহাজ

নোঙর পরীক্ষা করতেই বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। কোনো কারণে নোঙর তুলে ফেলা হয়েছে হিসপানিওলার। মাতাল অবস্থায় নিশ্চয় এই কাজ করেছে ইসরায়েল। ভাটার সময় জায়গামতোই ছিল জাহাজটা। কিন্তু জোয়ার আসতেই দক্ষিণা স্রোতের টানে ভেসে চলে এসেছে অন্তরীপের কাছে, রাতের বেলা।

কেবিনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইসরায়েল কেমন আছে

জানা দরকার। পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলতে গিয়েও একটা কথা মনে পড়ায় ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে ইসরায়েল। তারমানে তার পা ভাঙেনি, মিছে কথা বলেছে।

হাত দিয়ে পকেটের পিস্তল স্পর্শ করে নিলাম একবার। তারপর খুলে দিলাম তালা। দরজা খুলেই দেখি, মেঝেতে বেকায়দা ভঙ্গিতে বসে আছে ইসরায়েল। আমাকে দেখে ই পা ভাঙার অভিনয় শুরু করেছে আবার। আরও সাবধান হতে হবে, নিজেকে হুঁশিয়ার করলাম।

আমাকে দেখেই ইসরায়েল জানালো, ক্ষিদে পেয়েছে তার।

ইসরায়েলকে বসে থাকতে বলে খাবার আনতে ভাঁড়ারে গেলাম। রাম আর নেই। খুঁজেপেতে একটা ব্রাণ্ডির বোতল বের করলাম। কিন্তু সামান্যই অবশিষ্ট আছে তাতে। কিছু বিস্কুট নিলাম, আর নিলাম ভিনিগারে ভেজানো ফল, কিছু কিসমিস আর এক টুকরো পনির। ফিরে এলাম কেবিনে। তেমনি বসে আছে ইসরায়েল।

ব্রাণ্ডির বোতলটা আর কিছু খাবার তুলে দিলাম ইসরায়েলের হাতে। তার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসলাম আমি।

'জাহাজটা এখন আমার দখলে,' খেতে খেতে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম ইসরায়েলকে। 'খেয়ে উঠেই পতাকাটা বদলে ফেলবো।'

খাওয়া শেষ করে কেবিনেট খুঁজে একটা পতাকা বের করলাম, ব্রিটেনের পতাকা। তারপর গিয়ে জলি রোজার খুলে ফেলে তার জায়গায় দেশের পতাকা ওড়ালাম। পতাকা ওড়াতে ব্যস্ত থাকার সময় কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ইসরায়েল, টের পাইনি। আচমকা ঘাড়ের কাছে শীতল স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলাম। ঘুরতে যেতেই

ইসরায়েলের ভয়ংকর গলা শোনা গেল, 'খবরদার! নড়বে না!' আমার পকেটে তার হাত ঢুকে গেল। পিস্তল দু'টো বের করে নিল ইসরায়েল। তারপর বললো, 'পতাকা যেটা খুশি ওড়াও, ওসব পাগলামিতে কিচ্ছু যায় আসে না আমার!' ঘাড়ের কাছে থেকে ছুরিটা সরিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ইসরায়েল।

ঘুরে চাইলাম আমি।

তেমনি ভয়ংকর কণ্ঠে বললো ইসরায়েল, 'জাহাজ এখন আমার দখলে। যা বলছি, শোনো। নোঙর তুলে দাও। পাল ওড়াও। তারপর আমি যেদিক বলবো, নিয়ে যাবে।'

কি আর করবো। পালগুলো জায়গামতো খাটানোই আছে। দড়িগুলো টান টান করে বেঁধে দিলেই হলো। দিলাম। স্রোতের টানে এমনিতেই ভাসছিল জাহাজ। বাতাস লেগে ফুলে উঠলো পাল। গতি বেড়ে গেল। হাল ধরলাম আমি। সত্যিই, জাহাজটা চালানো তেমন কঠিন নয়, জমিদার ট্রেলনী ঠিকই বলেছেন। কিন্তু জীবনে এই প্রথম হাল ধরলাম, ভুল হতেই লাগলো। তবু এঁকেবেঁকে এগিয়ে চললো জাহাজ।

অনুকূল বাতাস আর স্রোতের টানে দুপুর নাগাদ দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছে গেল জাহাজ। দ্বীপের উত্তর-পুব কোণ থেকে নর্থ ইনলেটের মুখ পর্যন্ত চলে এলাম সহজেই। পাশে থেকে আমাকে সাহায্য করছে ইসরায়েল।

ইনলেটের মুখ থেকে মাইল দু'য়েক পথ ভেতরে ঢুকতে হবে এবার। প্রবেশ পথ খুবই সংকীর্ণ, সাবধানে এগোতে হবে, নইলে যে কোনো সময় চড়ায় আটকে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। হাল ধরলো এসে ইসরায়েল। নিপুণ হাতে চালিয়ে নিয়ে চললো জাহাজ।

খুব ধীরে সমস্ত বাধাবিপত্তি এড়িয়ে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। এদিক-ওদিক বারবার মোড় নিয়ে এগিয়ে একটা সরু খাঁড়িতে এসে ঢুকলো। সামনেই জঙ্গল। আর যাবে না জাহাজ।

থামাতে দেরি করে ফেললো ইসরায়েল। ঘটে গেল চরম বিপত্তি। প্রচণ্ড জোরে বালির চড়ায় ধাক্কা খেলো হিসপানিওলা। একটা পাশ উঠে পড়লো বালিতে। কাত হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী। ভয়ানক জোরে নড়ে উঠলো হাল, ঘুরে গিয়ে বাড়ি মারলো ইসরায়েলের চোয়ালে-মাথায়। রেলিঙ টপকে ছিটকে গিয়ে পানিতে পড়লো লোকটা। অগভীর পানির তলায় চকচকে বালিতে বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে পড়ে রইলো সে। ভাবলাম, উঠে পড়বে, কিন্তু উঠলো না। মাথার কাছ থেকে কালচে-লাল তরল পদার্থের একটা সূক্ষ্ম ধারা রঙিন ধোঁয়ার মতো উঠতে লাগলো। বিমূঢ়ের মতো সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

আধ মিনিট পরেই ইসরায়েল হ্যাণ্ডসের দেহের ওপর এসে স্বচ্ছন্দে নড়েচড়ে বেড়াতে লাগলো ছোট ছোট মাছ।

ঈশ

শত্রু-শিবিরে

জাহাজে আমি এখন একা। ভাটা শুরু হয়েছে আগেই। পশ্চিম আকাশে ঢলেছে সূর্য। অ্যাংকোরেজের ওপর দিয়ে পশ্চিম উপকূল

পেরিয়ে এসে জাহাজের ওপর নক্সা-কাটা ছায়ার সৃষ্টি করেছে বড় বড় পাইনের ছায়া। পড়ন্ত বিকেলের মৃদু বাতাসে অজানা বুনো ফুলের সুবাস। পুবের পাহাড়ে বাধা পেয়ে আসা ঝিরঝিরে বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে জাহাজের পাল। পুরো হিসপানিওলাকে কেমন যেন ভূতুড়ে জাহাজের মতো মনে হচ্ছে এখন আমার। আর থাকা যায় না এখানে দুর্গে পৌঁছানোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এবারে আর পথ হারাবো না, পথ চেনা হয়ে গেছে। দ্বীপের ধার ধরে ধরে এগিয়ে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবো স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ধারে, আসার সময় বার বার দেখে নিয়েছি কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে। আর স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি যেতে পারলে পৌঁছানো কঠিন হবে না।

কাত হয়ে থাকা জাহাজের দড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলাম ভেজা বালিতে। কাদাপানি ভেঙ্গে এসে উঠলাম তীরে। আর এক-বার জাহাজটার দিকে তাকিয়ে সোজা হাঁটা দিলাম।

পুরো অ্যাংকোরেজে সাঁঝের ছায়া নামছে। পুবের আকাশে সোনালী আলো, ধীরে ধীরে গাঢ় লাল রক্তের রঙে রূপ নিচ্ছে। আধ মাইল মতো এগোতেই হালকা হয়ে এল জঙ্গল। ডুবে গেল সূর্য।

গোধূলির ধূসর আলোতে ছায়াঢাকা বনের বাইরের দ্বীপের তীর ধরে এগিয়ে চলেছি। একটা ছোট পাহাড় পেরোলাম, একটা ছোট নদী পেরোলাম, দু'টো ছোট পাহাড়ের মাঝের উপত্যকা পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম। চলেছি তো চলেছিই, বিরাম নেই।

রাত হয়েছে। কালো অন্ধকারে ঢেকে গেছে রত্নদ্বীপ। হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। কালো অন্ধকারে সাদাটে বালির সৈকত আবছা ধূসর দেখাচ্ছে। আকাশে রাশি রাশি তারার মেলা। কালো আকাশের চাঁদোয়ায় মণি-মুক্তোর কাজ করেছে যেন কোনো নিপুণ

শিল্পী।

পথে এক জায়গায় একটা ঝর্ণার ধারে বসে, জাহাজ থেকে সঙ্গে নিয়ে আসা বিস্কুট আর কিসমিস বের করে খেলাম। তারপর আবার শুরু হলো চলা।

মাঝরাত পেরোলো। হঠাৎই খেয়াল করলাম, কালো অন্ধকার কেটে গেছে। কেমন ধূসর হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। পুব আকাশে হলুদ আলোর আভাস। চাঁদ উঠছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। খুশি হয়ে উঠলো মনটা। এবারে পথ চলা অনেকখানি সহজ হবে।

ক্রমেই আরও ওপরে উঠে এল চাঁদ। গাছপালার মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় পড়েছে এসে জ্যোৎস্না। পরিষ্কার সাদা বালির রঙ হয়ে উঠেছে হলদেটে।

স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে পৌঁছুতে হলো না, একেবারে দুর্গেই পৌঁছে গেলাম। পাহাড়ের মাথায় কাঠের দুর্গটা চাঁদের আলোয় কেমন ভৌতিক দেখাচ্ছে। থমকে দাঁড়ালাম মুহূর্তের জন্যে। বাড়ি ফেরার আনন্দ অনুভব করছি। ছুটলাম।

এক ছুটে এসে দাঁড়ালাম বাইরের বেড়ার প্রবেশ পথের কাছে। তারপর ঢুকে পড়লাম। দুর্গের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ভেসে এল। ডানা ঝটপটানির শব্দ। ঢুকে পড়লাম ঘরের ভেতরে।

অন্ধকার ঘর। আলো জ্বালেনি কেন? দুই পা এগিয়েই হোঁচট খেলাম, শুয়ে থাকা কারও গায়ে পা পড়েছে। 'কে!' উত্তেজিত কণ্ঠে ধমকে উঠলো লোকটা। আশ্চর্য তো! কে এই লোক!

ঠিক এই সময়ই ধাতব কণ্ঠে ডাক শোনা গেল, 'পিসেস অফ এইট···পিসেস অফ এইট···পিসেস অফ এইট···'

'চু-ও-প !' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠে পাখিটাকে থামালো সিলভার। পরক্ষণেই জ্বলে উঠলো দিয়াশলাইয়ের কাঠি।

মশালের রক্তিম আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে ভেতরটা। কাঠের দেয়ালে কাঁপছে ছায়া। মোট ছয়জন লোক দেখতে পাচ্ছি।

সিলভারের কাঁধে চড়ে বসেছে ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্ট—তোতা পাখিটা। ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে পালকগুলো সাজিয়ে নিচ্ছে। আগের চেয়ে রুগ্ন হয়ে গেছে লঙ জন সিলভার, চেহারা ফ্যাকাসে। পরনে সেই তামার বোতাম লাগানো নীল কাপড়ের ঝুল-কোট। আমাকে দেখে হাসলো, 'আরে, জিম হকিন্স যে ! আকাশ থেকে নামলে মনে হয় !'

কিছু বললাম না।

পাইপ বের করে তামাক ঠাসলো সিলভার। তারপর ডাকলো, 'এই ডিক, একটু আগুন দাও তো !'

পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে টানতে টানতে বললো, 'তুমি হুট করে এসে ঢুকে পড়লে যে ? জানো না নাকি কিছু ?···ও, তোমার জানার তো কথা নয়···তা এসো, তোমাকে বন্ধুভাবেই নেবো।' একটু থেমে মশালের আলোয় আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বললো, 'মনে হয় অনেক পথ পেরিয়ে এসেছো, অনেক ধকল গেছে। প্রথমেই বুঝেছিলাম চালাক ছেলে, কিন্তু এতটা চালাক, বুঝিনি ! তা চালাক হওয়া ভাল।' মাথা ঝাঁকালো সিলভার।

চুপ করে রইলাম।

পাইপে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিল সিলভার। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, জিম, চালাক ছেলে আমার পছন্দ। ছোটবেলায় তোমারই মতো চঞ্চল ছিলাম আমি, রোমাঞ্চ

ভাল লাগতো। ...তা এক কাজ করো না, আমার দলে চলে এসো। ট্রেজার আইল্যাণ্ডের ধনরত্ন আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নাও। কে জানে একদিন হয়তো তুমি নিজেই একটা জাহাজ কিনে নিয়ে ক্যাপ্টেন হতে পারবে।...আসবে?'

'এখুনি বলতে হবে?' আমাকে এখনও মোটামুটি ভাল চোখেই দেখে সিলভার, জেনে সাহস পেলাম কিছুটা।

'ভেবেচিন্তেই বলো।'

'তাহলে তার আগে জানতে হবে ডাক্তার লিভসী, স্কোয়্যার ট্রেলনী, ক্যাপ্টেন স্মলেট...এঁরা কোথায়।'

'তাতো ছাই আমিও জানি না।'

সিলভার সত্যি কথাই বলছে, মনে হলো আমার।

'ও। কিন্তু তোমার দলে গিয়ে লাভ কি, সিলভার? তোমাদের অবস্থা এখন শোচনীয়। লোকজন বেশির ভাগই মারা পড়েছে, ম্যাপ নেই—গুপ্তধনের আশাও গেছে, জাহাজটাও হারালে...ওহহো, বলেই নিই, ব্রায়ানকে খুন করেছে ইসরায়েল। রাতের বেলা বোধহয় মাতাল হয়েই ওরা নোঙর তুলে ফেলেছিল, স্রোতের টানে ভেসে যায় জাহাজে। আমিও ছিলাম তখন ওতে, তোমাকে খুঁজতেই গিয়েছিলাম। তারপর জোর করে আমাকে জাহাজ চালিয়ে নিতে বাধ্য করে ইসরায়েল...কোথায় আছে এখন হিসপানিওলা, বলবো না। হ্যাঁ, তারপর আচমকা এক বালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে গেছে জাহাজ। হালের বাড়ি খেয়ে বোধহয় ঘাড় ভেঙ্গে গিয়েই মারা গেছে ইসরায়েল। নিজের চোখে দেখেছি আমি লাশটা।' এই পর্যন্ত বলে থামলাম। বোকার মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সব ক'টা ডাকাত। জোর দিয়েই বললাম, 'ভেড়ার দলে কেন আসবো...'

'তবে রে!' কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠলো এক ডাকাত। মরগান। স্পাই-গ্লাস সরাইখানার সেই লোকটা।

'খবরদার, মরগান!' চেঁচিয়ে উঠলো সিলভার, 'বাড়াবাড়ি আমি একদম পছন্দ করি না। ফিরে এসো বলছি!'

দাঁড়িয়ে পড়লো মরগান। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো এক ডাকাত, 'কেন, ঠিকই তো করছে মরগান। পুঁচকে শয়তানটা আমাদের ভেড়ার পাল বলে...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই করছে ও, 'মরগানের পক্ষে সায় দিল আরেকজন।

ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকালো সিলভার। চোখে আগুন। চাপা ভয়ংকর গলায় বললো, 'কি হলো, আমাকেই ধরে মারবি মনে হচ্ছে? ঠিক আছে, আয় দেখি, আয় ছুরি নিয়ে আয়, দেখি কার ঘাড়ে ক'টা মাথা। আয়...কি হলো হাঁদার দল, আয়!'

সিলভারের এই ভয়ংকর মূর্তি এর আগে নিশ্চয় ওই ডাকাত-গুলোও দেখেনি। বাতাস বেরোনো বেলুনের মতো চুপসে গেল ওরা।

'কি হলো, আসছিস না কেন?' কর্কশ কণ্ঠে বললো সিলভার, 'প্যান্ট খারাপ করে ফেলেছিস না কি? এই নিয়েই এত বাহাদুরী? শুনে রাখ, এই ছেলেটিকে পছন্দ করি আমি, কাজেই ওর ওপর কারও হাত তোলা চলবে না। সবদিক থেকেই তোদের যে-কারও চেয়ে ভাল সে।'

কোনো কথা নেই আর কারও মুখে। মশালের আলোয় কিন্তুত সব ছায়া নাচছে কাঠের দেয়ালে। বুকের ভেতরটা দুপদাপ করছে আমার, কিন্তু তবু ক্ষীণ একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আমাকে খুন করবে না সিলভার।

রূপ পাল্টে গেছে সিলভারের। দাঁতের ফাঁকে পাইপ, হাত দু'টো

বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা, মুখের ভাব শান্ত, কাঁধে চুপচাপ বসে থাকা তোতাপাখি, ইত্যাদি সব মিলিয়ে কেমন যেন গির্জায় প্রবেশরত লোকের মতো মনে হচ্ছে তাকে এই মুহূর্তে।

ফ্যাকাসে মুখ তুলে বার বার সিলভারের দিকে তাকাচ্ছে ডাকাতেরা। উসখুস করছে।

অনেকক্ষণ একটানা চুপচাপ পাইপ টানলো সিলভার। তারপর দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা বের করে থুথু ফেললো মাটিতে। সঙ্গীদের সবার মুখের দিকে তাকালো একবার করে। শেষে জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু বলবে মনে হচ্ছে, তোমরা?'

'দেখো সিলভার,' একজন বললো, 'কতকগুলো কথা জানার আছে আমাদের। তোমাকে নেতা মেনেছি, আমাদের প্রশ্নের জবাব তোমাকেই দিতে হবে। কিন্তু দয়া করে যদি বাইরে আসো...' উঠে দাঁড়ালো লোকটা। তারপর ধীর শান্ত পায়ে হেঁটে ঘরের বাইরে চলে গেল। একে একে তাকে অনুসরণ করলো অন্য ডাকাতেরা। ঘরে রয়ে গেলাম কেবল আমি আর সিলভার।

'লক্ষণ খারাপ,' মৃদু কণ্ঠে বললো সিলভার, 'আমাকেও মানতে চাইছে না এখন ওরা। নাহ্, আর কোনো আশাই নেই...' এদিক-ওদিক মাথা দোলালো সে।

'মানে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ধনরত্ন তো পেলামই না, গলাটাও ফাঁসির দড়ি দেখছে। তার আগে ওই ব্যাটারাই হয়তো শেষ করে দেবে আমাকে। ওদের মতো লোক নিয়ে দল গড়লে পরিণতি এমনি হবে, আগেই বোঝা উচিত ছিল! আমিও এমন ভুল করলাম!'

হুট করে বলে বসলাম, 'এই মুহূর্তে তুমি মরলে, আমিও বাঁচতে

পারবো না। এসো, আমরা দু'জনে মিলে রুখে দাঁড়াই।'

'চমৎকার! এই তো কাজের ছেলের মতো কথা! তোমার কানা-কড়ি বুদ্ধি আর সাহস ওই হারামজাদাদের ঘটে থাকলেও এমনভাবে হেরে যেতাম না।'

পাইপের পোড়া তামাকটুকু ফেলে দিয়ে নতুন করে তামাক ভরলো সিলভার। ধরালো। কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'জানি, কথাটা শুনলে হাসবে তুমি! কিন্তু বিশ্বাস করো, এই মুহূর্ত থেকে জমিদার ট্রেলনীর দলে যোগ দিলাম আমি। তুমি সাক্ষী। কি, আমার হয়ে বলবে তো জমিদারের কাছে?'

'বলবো,' নির্দ্বিধায় জবাব দিলাম।

'বেশ, সত্যি কথাটা বলা যায় এবার তোমাকে। সকালে আমার কাছে এসেছিলেন ডাক্তার লিভসী। ম্যাপটা দিয়ে গেছেন। বুদ্ধু বনে গিয়েছিলাম তখন! ঈশ্বরই জানে, ব্যাপারটা কি!'

কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমিও। বোকার মতো চেয়ে রইলাম সিলভারের দিকে।

এ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না, ঠিকই বুঝলো সিলভার। শ্রাগ করলো। নড়েচড়ে উঠে আবার যুত করে বসলো কাঁধের তোতাটা।

'বাইরে আমি যাচ্ছি না, জিম,' বললো সিলভার। 'আসলে খুন করতে ডাকছে ওরা আমাকে। যুদ্ধের জন্যে তৈরি থাকো।'

তেইশ

আবার ব্ল্যাক স্পট

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ডাকাতটা, মরগানের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে। বাইরে থেকেই ভয়ে ভয়ে চাইলো সিলভারের দিকে।

ডাকাতটার দিকে একবার চোখ তুলে চেয়েই আবার ফোকরে চোখ রাখলাম। বাইরে ডাকাতেরা কি করছে দেখছি। আঙিনার এক জায়গায় আগুন ধরিয়েছে ওরা, গোল হয়ে ঘিরে বসেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দূত পাঠিয়েছে। যে ছুরিটা নিয়ে আমাকে তেড়ে এসেছিল মরগান, ওটা এখনও হাতে আছে ওর। বার বার বালিতে গাঁথছে, বের করছে। উত্তেজিত চেহারা। চাঁদের আলোয় বাইরের জঙ্গলকে কেমন যেন ভৌতিক দেখাচ্ছে।

'এসো, ঢুকে পড়ো,' দরজায় দাঁড়ানো ডাকাতটাকে ডাকলো সিলভার। 'দূতকে খেয়ে ফেলি না আমি।'

একবার হাস্যকরভাবে অঙ্গভঙ্গি করলো লোকটা, দারুণ ভয় পাচ্ছে। সিলভারের কথায় একটু যেন ভরসা পেল, ঢুকেই পড়লো। আস্তে করে ডান হাতটা বাড়ালো। মুঠোয় আছে কিছু।

'কি ওটা?' আমাকে বললো সিলভার, 'এই জিম, নাও তো দেখি।'

এগিয়ে গিয়ে নিলাম। একটা কাগজের ছোট টুকরো। সিলভারের কাছে নিয়ে এসে দিলাম।

মশালের আলোয় জিনিসটা দেখলো সিলভার। আমিও দেখলাম। একি?

'হুঁমম, ঠিকই অনুমান করেছিলাম,' বললো সিলভার। 'আমাকে ব্ল্যাক স্পট দিয়েছে! আরে, বাইবেলের পাতা ছিঁড়ে লিখেছে দেখছি!'

'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বললো দূত।

'কোন্ ব্যাটা ডাকাত আবার বাইবেল সঙ্গে রাখে?'

'ডিক।'

'ব্যাটা হাঁদারাম! বাইবেলটা পড়তে বলগে ওকে, মরার আগে প্রার্থনা করে নিক।'

'উল্টো দিকেও লেখা আছে,' বললো দূত।

কাগজের টুকরোর উল্টো পিঠে হাতে লেখা কথাগুলো পড়লো সিলভার। হাসি ফুটলো মুখে, 'বা-বা-বা! আমাকে পদচ্যুত করেছে! মাথামোটা গাধারা এছাড়া আর কিইবা করবে! চমৎকার জিনিস নিয়ে এসেছো হে তুমি, জর্জ!'

'তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে, সিলভার। ব্ল্যাক স্পট তো পেলেই,' বললো জর্জ। দেখে নিয়েছে সে, সিলভারের হাতে ছুরি নেই।

'তোমাদের ব্ল্যাক স্পটের কোনো দামই নেই আমার কাছে,' গম্ভীর হয়ে গেছে সিলভার।

'আছে, এখন আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তোমাকে ব্ল্যাক স্পট দেবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই অভিযানটা তুমিই ভণ্ডুল করেছো, এক নম্বর। শত্রুদেরকে দুর্গ থেকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছো, দুই নম্বর। ওদেরকে আক্রমণ করতে চাও না, কেন কে জানে! —এই তিন নম্বর। আর চার নম্বর হলো, এই বিচ্ছু ছেলেটার পক্ষে থেকে একেও

বাঁচাতে চাইছো। কেন?'

'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'তোমাকে ব্ল্যাক স্পট দিতে এইই যথেষ্ট।'

'ঠিক আছে, চারটে কারণেরই উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছি। অভিযান আমি পণ্ড করেছি, না তোমরা করেছো? আমার কথামতো চলেছো তোমরা? চলোনি, চললে আজ এই অবস্থায় পড়তে না। আর শত্রুদেরকে কেন ছেড়ে দিয়েছি, জিজ্ঞেস করছো? তোমরা তো মারামারি করে কেউ মাথা ফাটিয়েছো, কেউ শরীরের ওপর অত্যাচার করে রোগ বাধিয়েছো, ওই ডাক্তার লিভসী কি তোমাদের ওষুধ দেননি? সকালে দয়া করে তোমাদের না দেখলে এতক্ষণে দুনিয়ায় থাকতে কিনা, সন্দেহ। আর ক্যাপ্টেন স্মলেট, তাঁকে ছাড়া দেশে ফিরবে কি করে শুনি? এখন এই বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে পড়েছো। একে মেরে ফেললে কি লাভ হবে? বরং এ বেঁচে থাকলেই আমাদের লাভ। ও আমাদের পক্ষে দু'চার কথা বললেও বলতে পারে। কে জানে, দয়া করে-আমাদের ছেড়েও দিতে পারেন স্কোয়্যার ট্রেলনী,' কাঠের দুর্গে গম গম করছে সিলভারের ভরাট কণ্ঠস্বর। একটানা কথা বলে থেমে দম নিল খোঁড়া দস্যু। তারপর কোমরের বেল্টের খোপ থেকে অয়েল ক্লথে মোড়ানো একটা ছোট প্যাকেট বের করলো। এই প্যাকেট আমার অতি পরিচিত। 'নাও, দেখো,' বলে প্যাকেট খুলে হলদেটে ম্যাপটা বের করলো সে। এগিয়ে এসে ওটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো জর্জ। একবার দেখেই চেঁচিয়ে ডাকলো সঙ্গীদের।

কে কার আগে ঢুকবে, ধাক্কাধাক্কি করে ভেতরে এসে ঢুকলো ডাকাতগুলো। বেড়াল যেমন ইঁদুরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে,

তেমনি ওরাও ম্যাপটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। একজনের হাত থেকে আরেকজন ছিনিয়ে নিচ্ছে, গালমন্দ করছে, হি হি করে হাসছে, একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে লোকগুলো।

'হ্যাঁ, একেবারে আসলটা!' বললো মরগান, 'ওই তো, জে. এফ. লেখা রয়েছে!'

'কিন্তু ধনরত্ন পেলেই বা লাভ কি!' হঠাৎই যেন ম্যাপের ওপর থেকে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে জর্জ, 'ওগুলো নিয়ে দেশে ফিরবো কি করে? জাহাজ কই?'

'তাই তো!' মুখ তুললো মরগান।

'এবার কিন্তু আর আমাকে দোষ দিতে পারবে না,' বললো সিলভার। 'ধনরত্ন চেয়েছিলে তোমরা, সন্ধান দিয়েছি আমি। কি করে, কাকে নিয়ে দেশে ফিরবে, আমি কিচ্ছু জানি না।'

'প্লীজ, সিলভার! বারবিকিউ!' মরগান ছাড়া অন্য সবাই হাতজোড় করতে লাগলো, 'তুমিই আমাদের ক্যাপ্টেন! এভাবে আমাদের ঠেলে দিও না!'

'গুড গুড!' হাসলো সিলভার, 'এই তো লক্ষ্মী হয়ে উঠেছে ছেলেরা! তোমাদের মতো হিংসুটে নই আমি, তাই বেঁচে গেলে। তাহলে জর্জ, মরগান, এই ব্ল্যাক স্পট ছিঁড়ে ফেলতে পারি?'

'আলবৎ! অবশ্যই পারো!' সমস্বরে বলে উঠলো সবাই, মরগান ছাড়া। আমতা আমতা করছে সে।

'মাঝে থেকে খামোকা বাইবেলের পাতা ছিঁড়লাম,' ডিকের কণ্ঠে আক্ষেপ। 'আচ্ছা বারবিকিউ, যদি বাইবেলটায় চুমো খাই এখন, পাপ কাটবে?'

'তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে মাফ চাইতে হবে তোমাকে।'

সে রাতে আমার আর সিলভারের পাহারায় রইলো জর্জ মেরি। খোলাখুলিই সঙ্গীদের জানিয়ে দিল জর্জ, কেউ আমার বা সিলভারের কোনো ক্ষতি করতে চাইলে নির্দ্বিধায় খুন করবে সে।

কাজেই নিরাপদেই কেটে গেল বাকি রাতটুকু।

সকালে আমার ঘুম ভাঙলো ডাক্তারচাচার ডাকাডাকিতে। 'আমি ডাক্তার এসেছি হে, দুর্গবাসীরা, ওঠো, ওঠো, উঠে পড়ো।' আন্তরিকতায় ভরা তাঁর কণ্ঠস্বর।

উঠে গিয়ে ডাক্তারচাচাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসছে সিলভার। চোখ রগড়াতে রগড়াতে এক ছুটে বেরিয়ে এলাম। বাইরে কুয়াশা কাটেনি এখনও। ঘোলাটে আলো পুবে, কুয়াশার ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে না। জঙ্গলের মাথায় কুয়াশা জট পাকিয়ে আছে যেন, তারই ভেতর থেকে ভেসে আসছে ভোরের পাখিদের কলরব।

'আরে জিম যে!' উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন ডাক্তারচাচা আমাকে দেখে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলাম। তাঁদেরকে না জানিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তার মাঝে রেখেছিলাম, সেজন্যে লজ্জা লাগছে এখন।

'ঠিক আছে, পরে কথা বলবো তোমার সঙ্গে,' বললেন ডাক্তারচাচা, 'আগে রোগীদের সঙ্গে কথা বলে নিই।'

দুর্গের ভেতরে ঢুকলেন ডাক্তারচাচা। এক নজর চোখ বোলালেন, 'বাহ্, সেরে উঠেছে মনে হচ্ছে সবাই! এই তো চাই! এমন রোগী নাহলে ডাক্তারী করে সুখ আছে?' জর্জের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই জর্জ, মুখটা শুকনো কেন? লিভারের ওষুধ

খেয়েছিলে ঠিকমতো ?'

'জ্বী, খেয়েছিলাম।'

'তাহলে মুখ অত শুকনো কেন ?'

'সারা রাত জেগে পাহারা দিয়েছে তো, তাই,' বললো ডিক।

'কিন্তু তোমার কিছু যেন হয়েছে ? ভয় পাচ্ছো যেন ? এসো তো, জিভটা দেখি।'

'কিচ্ছু হয়নি ওর, ডাক্তারসাহেব,' বললো মরগান। 'বাইবেলের পাতা ছিঁড়েছিল, এখন পাপের ভয়েই বেচারা আধমরা।'

ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তারচাচা। সংক্ষেপে ব্যাপারটা ব্যক্ত করলো জর্জ। ডিকের মুখের দিকে চাইলেন ডাক্তারচাচা। তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন। একে একে হাসিটা সংক্রামিত হলো সবার মাঝেই, সিলভার ছাড়া। চিন্তিতভাবটা কাটছে না ওর চেহারা থেকে।

আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেল সিলভার। ফিসফিস করে বললো, 'ওদের বিশ্বাস করতে মানা করো ডাক্তারসাহেবকে। ওই বিশ্বাসঘাতকদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না আমি। টাকার গন্ধ পেলে রক্তলোভী নেকড়ের মতো হয়ে উঠে ওরা।'

সবার সঙ্গে কথা শেষ হলে আমার দিকে ফিরলেন ডাক্তারচাচা। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যেতেই চোখের ইশারায় চুপ থাকতে বললাম।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমরা, ডাকাতেরা যাতে কোনো কিছু সন্দেহ করে না বসে এভাবে। আমি দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে গত রাতে ফিরে আসা পর্যন্ত সব কথাই বললাম তাঁকে। সবশেষে একটু আগে সিলভারের হুঁশিয়ারির কথাও জানালাম।

চিন্তিতভাবে দুর্গের দিকে ফিরে চাইলেন ডাক্তারচাচা। আমিও চাইলাম। বাইরে বেরিয়ে এসেছে সিলভার। কাঁধের তোতাটাকে দানা খাওয়াচ্ছে।

ঘুরে দ্রুত হেঁটে বনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ডাক্তারচাচা। আমি চললাম দুর্গের দিকে।

চব্বিশ

ফ্লিন্টের সাংকেতিক নিশান

'গুপ্তধনের সন্ধানে যাবো এবার আমরা, জিম,' আমি কাছে যেতেই বললো সিলভার, 'কিন্তু মোটেও ভাল লাগছে না আমার ব্যাপারটা। মোহর দেখামাত্রই পাগল হয়ে উঠবে জানোয়ারগুলো। এদিকে যদি যেতে না চাই, তাহলেও ক্ষেপে যাবে। আমাদের সারাক্ষণই হুঁশিয়ার থাকতে হবে, বুঝেছো?'

ঘাড় নাড়লাম।

এই সময় আগুনের কাছ থেকে ডাকলো একজন, নাস্তা তৈরি। এগিয়ে গিয়ে আর সবার পাশে বসে পড়লাম। বিস্কুট আর কিছু শুকনো ফল দিয়ে নাস্তা সারা হলো।

ডাক্তারচাচা চলে যাবার পর থেকেই একটা কথা সারাক্ষণ খোঁচাচ্ছে আমাকে। তখনি জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। ডাকাতদের হাতে

দুর্গের ভার দিয়ে কোথায় চলে গেছেন ওঁরা ? কেন ? থাকছেন কোথায় ? আবার যে ম্যাপ সম্বল করে এত দূর আসা হয়েছে, সেটাই বা হুট করে ডাকাতদের হাতে তুলে দিলেন কেন ? এসব ব্যাপার একেবারেই দুর্বোধ্য ঠেকছে আমার কাছে।

রওনা হলাম সবাই। আমাদের দলটা অদ্ভুত। আমি ছাড়া সবারই পরনে নাবিকের ময়লা পোশাক, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সিলভারের সঙ্গে দু'টো বন্দুক, পকেটে দু'টো পিস্তল, কোমরে ঝোলানো ছুরি, কাঁধে ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট। সারাক্ষণই বকর বকর করছে তোতাটা, দুর্বোধ্য বুলি আওড়াচ্ছে।

বড় এক বাণ্ডিল দড়ি বইবার ভার পড়েছে আমার ওপর। দড়ির একটা প্রান্ত ধরে আমার পেছনে পেছনে কিছুক্ষণ হাঁটলো সিলভার, যেন আমি সার্কাসের এক নাচিয়ে ভালুক। এই রসিকতায় হো হো করে হাসলো ডাকাতেরা।

অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও সকলেই কিছু না কিছু জিনিস বয়ে নিচ্ছে। কারও হাতে মাটি খোঁড়ার জন্যে শাবল, কারও হাতে দুপুরের খাবার জন্যে রুটি-মাংসের ঝোলা, কারও হাতে মদের বোতল, কারও হাতে গোলা-বারুদ। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসও আছে কারও কারও হাতে।

সার বেঁধে গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে বনের বাইরে সাগর তীরে এসে দাঁড়ালাম আমরা। নৌকা দু'টো খুঁটিতে বাঁধা আছে। বনের ভেতর থেকে বেরোতেই প্রচণ্ড রোদ ঝাপটা মারলো চোখেমুখে।

নৌকার কাছে এগিয়ে গেলাম। দু'টোকেই নড়বড়ে করে ফেলেছে ডাকাতেরা। একটা নৌকার হালের কাছটায় ভাঙা, মাঝির বসার জায়গা নেই। একটু নড়লেই পানি ওঠে। এই নৌকায় করে এক-

টানা বেশিক্ষণ চলা অসম্ভব। কিন্তু ওগুলোতে চড়েই অ্যাংকোরেজ পর্যন্ত যাওয়া স্থির হলো।

নৌকায় বসেই ম্যাপের সাংকেতিক নিশানা নিয়ে আলোচনা করলো সিলভার। লাল ক্রস দিয়ে চিহ্ন রাখা হয়েছে, কিন্তু পরিষ্কার নয়। আর পেছনের লেখাটা সহজবোধ্য নয়। গুপ্তধনের সংকেত সহজেই বোঝা যাবে, এটা আশাও করা যায় না অবশ্য।

টল ট্রি বা লম্বা গাছ, স্পাই-গ্লাস শোল্ডার, মানে স্পাই-গ্লাসের কাঁধ, ইত্যাদির মানে তেমন বোঝা না গেলেও একটা ব্যাপার পরিষ্কার, স্পাই-গ্লাসের কোথাও একটা লম্বা গাছ আছে, সেটা প্রধান নিশানা।

আমাদের সামনেই 'ক্যাপ্টেন কিডের অ্যাংকোরেজ', একে ঘিরে আছে শ তিনেক ফুট উঁচু এক মালভূমি। উত্তরে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে স্পাই-গ্লাসের দক্ষিণ কাঁধ। তীরে নৌকা ভিড়িয়ে নোঙর করে নামলাম আমরা সবাই।

মালভূমির চূড়ায় ঘন হয়ে জন্মেছে পাইন, বড় গাছগুলোর উচ্চতা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে, চারাও আছে প্রচুর। এগুলোর ভেতর থেকেই বের করে নিতে হবে সব চেয়ে লম্বা গাছটা। ব্যাপারটা সহজ নয়।

নেতৃত্ব দিচ্ছে সিলভার, স্বভাবতই সংকেত পড়ে নিশানা ঠিক করার ভারও তারই ওপর। হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। একটা, তারপর আরেকটা নদী পেরিয়ে, দ্বিতীয় নদীটার মোহনার কাছে এসে দাঁড়ালাম। স্পাই-গ্লাস পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসা নদীটার দুই তীরে ঘন জঙ্গল।

বাঁয়ে মোড় নিয়ে খাড়া মালভূমির দিকে উঠতে লাগলাম। নদীর তীরের মাটি ভেজা, আঠালো। শক্ত মাটিতে শেকড় গেড়ে লতিয়ে

লতিয়ে এই মাটির ওপর নেমে এসেছে নানা ধরনের কাঁটাওয়ালা এবং কাঁটাছাড়া লতাগুল্ম। এগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ চলতে ভারি অসুবিধে হচ্ছে। তবু একটু একটু করে এগিয়ে চললাম আমরা।

ক্রমেই আরও খাড়া হয়ে উঠছে পথ। শক্ত হয়ে আসছে মাটি, তার ওপর পাথর বিছানো। গাছপালা আর জঙ্গলের রূপও পাল্টাচ্ছে। সামনে মাঝে মাঝেই ফাঁকা। চমৎকার এখানকার প্রকৃতি। পথের পাশে সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে জন্মেছে নাম না জানা বুনো ফুলের গাছ। গাছে গাছে রঙিন ফুলের সমারোহ, প্রজাপতি উড়ছে। ঘাস-বনের পাশে নাটমেগের ঝোপ, এদিক-ওদিক বিশাল লালচে পাইন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ফুলের সুবাস, নাটমেগের তীব্র ঝাঁঝ আর পাইনের মিষ্টি গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। প্রকৃতির মাধুর্যে, এখানে, অনেকখানি ম্লান হয়ে এসেছে যেন রোদের তীব্রতা।

প্রচণ্ড হাঁকডাক হৈ হুল্লোড় করতে করতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগিয়ে চলেছি সবাই। সবার পেছনে সিলভার, আর তার আগে চলেছি আমি। ডাকাতেরা আমাদের বেশ অনেকখানি সামনে।

পায়ের নিচে বাড়ছে নুড়ি পাথরের সংখ্যা। সারাক্ষণই পা পড়ছে ওগুলোতে, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পাথর। পাশে পাহাড়ী নদীর মধুর কুলকুল আওয়াজ, যেন জলতরঙ্গের শব্দ।

খোঁড়া, তাই আলগা নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে চলতে স্বভাবতই কষ্ট হচ্ছে সিলভারের, আমি সাহায্য করছি তাকে মাঝেমধ্যে। নইলে পা ফসকে নিচে গড়িয়ে পড়তো সে অনেক আগেই।

মালভূমির চূড়ার কাছাকাছি এসে গেছি আমরা, এই সময় মহা চিৎকার শুরু করে দিল সব চেয়ে আগের লোকটা। কি ব্যাপার? সবাই ছুটলাম তার কাছে।

আমার ডান পাশ থেকে ছুটতে ছুটতে বললো মরগান, 'ব্যাটা অমন করছে কেন!'

গিয়ে দাঁড়ালাম লোকটার পাশে। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করতেই আঙুল তুলে দেখালো। চাইলাম। একটা বিশাল পাইনের নিচে সবুজ লতাপাতায় জড়িয়ে পড়ে আছে একটা কংকাল, হ্যাঁ মানুষেরই। অ্যাড-মিরাল বেনবোয় ক্যাপ্টেন বোনসের অশুভ পদক্ষেপের পর থেকে অনেক বীভৎস মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু তবু কেন যেন ঠাণ্ডা ভয়ের একটা স্রোত শির শির করে নেমে গেল আমার শিঁড়দাড়া বেয়ে।

সাহস দেখালো জর্জ মেরি। কংকালটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পায়ে ঠেলে কংকালের ওপরের কিছু লতাপাতা সরালো। ন্যাকড়ার মতো ছেঁড়া পুরোনো কাপড় জড়িয়ে লেগে আছে হলদেটে হাড়ের ওপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলো জর্জ, তারপর মন্তব্য করলো, 'লোকটা নাবিক ছিল। পোশাকটাও এককালে দামী ছিল।'

'এখানে নাবিক ছাড়া অন্য কেউ আসবে, আশাও করা যায় না!' চিন্তিত শোনালো সিলভারের কণ্ঠ, 'কিন্তু কংকালটার পড়ে থাকার ভঙ্গি একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?'

তাই তো! এতক্ষণ তো খেয়াল করিনি! একেবারে সিধে হয়ে পড়ে আছে কংকাল। শুধু তাই নয়, দু'টো হাতই মাথার ওপর দিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে। কিছু নির্দেশ করছে না তো?

পকেট থেকে একটা কম্পাস বার করলো সিলভার। কংকালটার অবস্থান আর কম্পাসের কাঁটার দিক নির্দেশ মিলিয়ে দেখলো ভাল করে। তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো, 'ঠিকই আন্দাজ করেছি। কংকালটা আসলে একটা সংকেত দিচ্ছে। হাত দু'টো যেদিকে দেখাচ্ছে, নিশ্চয় সেদিকেই কিছু আছে। কিন্তু ফ্লিন্টের রসিকতাটা দেখেছো?'

কংকাল ছাড়া আর কিছু দিয়ে সংকেত বানাতে পারেনি। এ নিশ্চয় তার ছয় সঙ্গীর একজন। কিন্তু কোন্ জন?' এগিয়ে গিয়ে কংকালটার পাশে বসে পড়লো সিলভার।

খুলিতে শুকিয়ে লেগে আছে চামড়া, এখনও। তাতে চুলও লেগে আছে। সেই চুলগুলোই ভাল করে দেখলো সিলভার। হাত দিয়ে মেপে দেখলো কতখানি লম্বা কংকাল। তারপর মুখ তুলে চাইলো, 'অ্যান্ড্রা-রাইস। আমি শিওর।'

'ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর খুনী!' গলা কেঁপে গেল মরগানের। 'ধার হিসেবে অনেক টাকা নিয়েছে আমার কাছ থেকে। কিন্তু চাইতে পারতাম না। চাইলেই ছুরি দেখাতো!' ভাবছে সে। 'ফ্লিন্টের সঙ্গে শেষবার এখানে আসার সময় আমার ছুরিটা নিয়ে এসেছিল। কোথায় ওটা?'

'আশপাশে তো দেখছি না!' বললো এক ডাকাত, 'পাখিরা নিশ্চয়ই ছুরি খায় না!'

'তাহলে কোথায় ওটা!' সিলভারকে আগের মতোই চিন্তিত দেখাচ্ছে।

কংকালের আশপাশ থেকে লতা সরিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখলো জর্জ। এদিক ওদিক মাথা দোলালো, 'নাহ্, কিচ্ছু নেই! একটা তামাকের বাক্স পর্যন্ত নেই! একেবারেই অস্বাভাবিক!'

'ফ্লিন্টের এটা কেমন ধরনের রসিকতা!' বললো সিলভার। 'বুঝতে পারছি, ছয় সঙ্গীকেই খুন করে রেখে গেছে ব্যাটা। কিন্তু লাশের সঙ্গে এই ব্যবহার কেন?'

'এটা তো আর নতুন কিছু নয়,' বললো মরগান, 'জানোই তো, ভয়ানক লোকটা নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিত এভাবেই। আমাদের কপাল ভাল, মরে ভূত হয়ে গেছে ব্যাটা, নইলে এই দ্বীপে গুপ্তধনের জন্যে

আসা...' হাতের আঙুলে চুটকি বাজিয়ে বাকি কথাটুকু বুঝিয়ে দিল সে।

ফ্লিন্টকে দেখিনি, কিন্তু তার সম্বন্ধে ডাকাতদের কথাবার্তা শুনে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলাম। তার নিষ্ঠুরতার নিদর্শন তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

'যাকগে, ওসব ভেবে আর লাভ নেই,' বললো সিলভার। 'ফ্লিন্ট মারা গেছে, আর কোনোদিন জ্বালাতে আসবে না। এখন চলো, যে কাজে এসেছি, শেষ করি।'

কংকালের নির্দেশিত দিকে এগিয়ে চললাম আমরা। আশপাশের দৃশ্য এখনও আগের মতোই সুন্দর, কিন্তু আর হুল্লোড় করছে না ডাকাতেরা। প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে পাশাপাশি মেপে মেপে পা ফেলছে ওরা, একে অন্যের থেকে আলাদা হতে ভয় পাচ্ছে। কথা বলতেও চাইছে না পারতপক্ষে। ফ্লিন্ট শুনে ফেললে আক্রমণ করে বসতে পারে, এই ভয় যেন চেপে ধরেছে সবাইকে।

পঁচিশ

কে! কে কথা বলে?

মালভূমির পশ্চিম অংশে সামান্য হেলে থাকা জায়গায় এসে বিশ্রাম নিতে বসলাম আমরা। এখানে, উঁচুতে বসে নিচের অনেক কিছুই

চোখে পড়ছে। সামনে, ঢালে জন্মে থাকা গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে নিচে দেখা যাচ্ছে অন্তরীপ, ঢেউয়ের সাদা ফেনা জমেছে। পেছনে, অ্যাংকোরেজ পেরিয়ে, স্কেলিটন আইল্যাণ্ড ছাড়িয়ে সাগরের ছোট ছোট ঢেউ কড়া রোদ প্রতিফলিত করে চোখ ধাঁধাচ্ছে আমাদের। একপাশে স্পাই-গ্লাস পাহাড়, চূড়ার কাছে ক্বচিত কদাচিত এক আধটা পাইন দাঁড়িয়ে, কালো কুৎসিত পাথুরে উপচূড়াগুলোর পাশে নেহাতই বেমানান। তীব্র রোদের হাত থেকে গা বাঁচাতে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে পাখিরা, ডাকাডাকি বন্ধ। শুধু দূরে নিচ থেকে ভেসে আসছে ঢেউয়ের অবিশ্রান্ত গর্জন। প্রকৃতির এই বিশালতায় নিজেকে একেবারেই ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

কম্পাসে চোখ রেখে একমনে কি হিসেব করছে সিলভার। তারপর মুখ তুলে বললো, 'ম্যাপ অনুসারে, স্পাই-গ্লাস পাহাড়ের কাঁধ নিশ্চয় ওই জায়গাটা,' পাহাড়ের একটা দিকে আঙুল তুলে দেখালো সে। ঘুরে খাবারের ঝোলাটার দিকে তাকালো, 'পেট জ্বলছে। গুপ্তধন পরে খোঁজা যাবে, এসো আগে পেট ঠাণ্ডা করি।'

'ক্ষিদে নেই,' বললো মরগান।

'কেন?'

'কংকালটা দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে।'

'ও।'

'নীলমুখো শয়তানটার কথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয় এখনও। হ্যাঁ, ফ্লিন্টের কথাই বলছি।'

'অতিরিক্ত রাম গেলার ফল,' বললো জর্জ। 'মুখ তো নীল হবেই।'

'ব্যাটা সত্যিই মরেছে তো?' সন্দেহ ডিকের গলায়।

'বিলি তো বলেছে, মরেছে। লাশের চোখের ওপরে নাকি দু'টো তামার পয়সাও রেখে দিয়েছিল বিলি। ওই ব্যাটাও ফ্লিন্টের চেয়ে কম যেত না। শেষ পর্যন্ত ও-ও মদ খেয়েই মরলো...' আচমকা বাধা পেয়ে থেমে গেল মরগান।

আমাদের সামনের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে হালকা গলায় কাঁপা কাঁপা গানের সুর। সেই গান ঃ

'সিন্দুকটা মরা মানুষের...'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে ডাকাতদের। আতংকে বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ।

'ফ্লিন্ট!' ফিসফিস করে বললো মরগান। কোটর ছেড়ে যে কোনো সময় ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন তার চোখ দু'টো, 'হলপ করে বলতে পারি, এ ফ্লিন্ট ছাড়া কেউ না!'

যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা মাঝপথেই থেমে গেল গান। গায়কের মুখ চেপে ধরেছে যেন কেউ! পাহাড়ের ঢালে পাইনের সবুজ মাথায় কড়া রোদ, প্রকৃতির মহান বিশালতা, পেছনে মাটিতে আর ঝোপের ওপরে পাইনের ছায়ার আলপনা, স্তব্ধ দুপুর, এই সময় এই আচমকা গান শুরু হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া কেমন যেন ভৌতিক অনুভূতির ছোঁয়া লাগালো সবার মনে। এমনিতেই অদ্ভুত প্রভাব ফেলেছে ফ্লিন্টের চিন্তা আর ওই কংকাল, এখন এই গান একেবারে বিমূঢ় জড় করে দিল যেন সবাইকে। স্তব্ধ হয়ে গেছে বেশি কথা বলা তোতাটাও।

রক্তশূন্য পাঁশুটে ঠোঁটে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে এমনকি সিলভারেরও, 'এত ভয় পেলে চলবে না! প্রেতাত্মা গান গাইতে পারে না, এ নিশ্চয় কোনো জ্যান্ত মানুষ! ফ্লিন্টের স্বর নকল করছে!'

আবার শোনা গেল গান। না না, গান নয়, কান্নার সুরে চেঁচিয়ে কথা বলছে কেউ। 'ডারবি ম্যাগ্র। ডারবি ম্যাগ্র!' হঠাৎই যেন গালাগাল দিয়ে উঠলো কণ্ঠস্বরটা, 'রাম নিয়ে আয় ডারবি!'

এর বেশি আর সইতে পারলো না একজন ডাকাতের স্নায়ু। কেঁদে ফেললো সে, 'আর না, আর না, বারবিকিউ, আর এগোবো না। চলো ফিরে যাই!'

'ঠিক এভাবেই, এই সব কথাই বলতো ফ্লিন্ট!' ফিসফিস করে বললো মরগান।

বাইবেল বের করে মন দিয়ে পড়তে শুরু করেছে ডিক, কাঁপছে থর থর করে।

পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকা আজব কণ্ঠস্বর গভীর মনোযোগে শুনছে সিলভার। তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো হো হো করে, 'ব্যাটা জমিয়েছে ভাল! এই, এই মরগান, ও ফ্লিন্ট নয়। কিন্তু অনেকটা ফ্লিন্টের মতোই বলছে। বলতো, মানুষের গলা আর বলার ভঙ্গি নকলে ওস্তাদ আমাদের মাঝে কে ছিল?'

একটু ভাবলো মরগান। মুখ তুলে সিলভারের দিকে চাইলো, 'বেন গান নয়তো?'

'হ্যাঁ, বেন গানই,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সিলভার। 'ওই হারামজাদাই। আমাদের ভয় দেখাচ্ছে শুয়োরটা।'

'চলো,' কর্কশ চাপা কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠলো জর্জ মেরি, 'চলো যাই! ব্যাটাকে পাঁদানি দেয়া দরকার আচ্ছা করে।'

সবারই মুখে রক্ত ফিরে এসেছে আবার, ডিক ছাড়া। এখনও বাইবেলের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করছে, মাঝেমধ্যে মুখ তুলে তাকাচ্ছে নিচে, পাহাড়ের পাদদেশের দিকে।

'কপাল ভাল তোমার, ও বেন গান,' টিটকিরি মারলো সিলভার, 'নইলে, ফ্লিন্টের ভূত হলে তোমার ঘাড়ই আগে ভাঙতো। শুনেছি, পাতাছেঁড়া বাইবেলকে ভয় পায় না ভূতেরা।' হাসলো আবার সে। কিন্তু তবু হাসতে পারছে না ডিক।

ক্রাচটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সিলভার। আমাদের নিয়ে রওনা দিল আবার।

খাড়াই বেয়ে ওঠার চেয়ে নামা সহজ। কাজেই চলার গতি দ্রুত হয়েছে আমাদের। ছোট বড় পাইনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। ম্যাপ দেখে দেখে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালো সিলভার। আকাঙ্ক্ষিত লম্বা পাইন গাছ খুঁজছে। বেশি খুঁজতে হলো না। ঝোপের মাথা ছাড়িয়ে আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে যেন দানবীয় পাইন, দু'শো ফুটের কম হবে না লম্বায়।

ক্রাচে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গাছটার কাছে এসে দাঁড়ালো সিলভার। নিচের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে কি যেন দেখছে। গুপ্তধন পেয়ে গেল নাকি?

ছুটে গেলাম। ডাকাতেরাও ছুটে এসে দাঁড়ালো গাছের গোড়ায়। কিন্তু একি!

পাগলের মতো মাটিতে ক্রাচ ঠুকছে সিলভার। জোরে জোরে মাথা নাড়ছে এদিক-ওদিক।

গাছের গোড়ায় মাটিতে বিশাল এক গর্ত। গর্তের ভেতর পড়ে আছে মরচে ধরা একটা কোদাল। প্যাকিং বাক্সের ভাঙা কাঠ ইতস্তত ছড়ানো। একটা কাঠের টুকরোর গায়ে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে নাম লেখা রয়েছে: "ওয়ালরাস"।

'ফ্লিন্টের জাহাজের নাম!' চাপা ক্রুদ্ধ গলা মরগানের, 'কিন্তু গুপ্ত-

ধন ? নিয়ে গেছে কেউ !'

টপাটপ গর্তের ভেতরে লাফিয়ে নামতে শুরু করলো ডাকাতেরা।

বিপদটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলো সিলভার। আস্তে করে সরে এল কয়েক পা। পকেট থেকে পিস্তল বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো, 'নাও, রাখো এটা। ব্যবহারের সময় এসেছে।'

পাগলের মতো গর্তের তলায় ধনরত্নের সন্ধানে ব্যস্ত ডাকাতেরা। কিন্তু কিচ্ছু নেই। সোজা হয়ে দাঁড়ালো মরগান। তীব্র দৃষ্টিতে চাইলো সিলভারের দিকে। দু'চোখে আগুন। ভয়ঙ্কর গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'এই তোমার মোহর ! বারবিকিউ, আর না, এইবার তোমাকে খুন করবো আমি !'

'তাই, না ?' হাসছে সিলভার, 'কিন্তু খোঁজা তো শেষ হয়নি। আরও ভাল করে দেখো দোস্ত, আলুটালু কিছু পেয়েও যেতে পারো। আর কিছু না হোক, পুড়িয়ে খেতে তো পারবে।'

লাফ দিয়ে পিস্তল বেরিয়ে এল মরগানের হাতে। 'খবরদার, শূয়োরের বাচ্চা ! তোর জন্যেই আজ এই অবস্থা আমাদের !'

মোহর খোঁজা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ডাকাতেরা। জর্জের হাতেও পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। আমি বা সিলভার কেউই পিস্তল বের করতে পারিনি, পকেটেই রয়ে গেছে।

ক্রাচে ভর দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সিলভার। চোখের পাঁপড়ি পর্যন্ত কাঁপছে না তার। স্থির চেয়ে আছে মরগানের পিস্তলের দিকে। ধীরে ধীরে বললো, 'উঁহু, তোমাদের ভুলের জন্যে আজ এই অবস্থায় পড়েছো। মোহর তো পেলেই না, প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারো কিনা, কে জানে !'

সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললো জর্জ, 'বন্ধুরা, এই ল্যাঙড়া হারামজাদা ঠকিয়েছে আমাদের। ওকে শেষ করে দেয়া উচিত, এখুনি। আর ওই বিচ্ছুটার চোখ উপড়ে না নিলে শান্তি পাবো না। ওটাই আসলে যত নষ্টের মূল...'

ঠিক এই সময় গর্জে উঠলো বন্দুক। আমাদের একপাশের ঝোপের ভেতর থেকে গুলি করছে কারা যেন। উল্টে গর্তের ভেতরে পড়ে গেল জর্জ। তার পাশে দাঁড়ানো ডাকাতটাও দুই হাত শূন্যে তুলে চিত হয়ে পড়লো কাটা কলাগাছের মতো। কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো সিলভারের কাঁধের তোতাটা।

চকিতে যা বোঝার বুঝে নিল মরগান। পাক খেয়ে ঘুরেই ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের ঝোপটার ভেতরে। তার সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপে ঢুকে গেল অন্য দুই ডাকাত। ঝোপঝাড় ভেঙে তাদের দ্রুত ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পালাচ্ছে।

গর্তের ভেতর নিথর পড়ে আছে একটা ডাকাত। আহত জর্জ মেরি হাত-পা ছুঁড়ছে, পিস্তলের এক গুলিতে তাকেও সঙ্গীর মতোই নিথর করে দিল সিলভার।

ওদিকে নাটমেগ ঝোপের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন ডাক্তারচাচা, হাতের বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখনও। তাঁর পেছন পেছনই বেরিয়ে এল বেন গান আর গ্রে।

পালিয়ে যাওয়া তিন ডাকাতের গমনপথের দিকে নির্দেশ করে বললেন ডাক্তারচাচা, 'ওদের পালাতে দেয়া যাবে না। নৌকা দু'টো দখল করে নিলে সর্বনাশ হবে। নৌকা ছাড়া আমরা অচল' বলেই ছুটলেন।

গ্রে আর বেন গান ছুটেছে ডাক্তারচাচার পিছু পিছু। আমিও

ছুটলাম। ক্রাচে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সিলভার। তার কাঁধের তোতাটা সমানে চেঁচাচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে নৌকা দুটোর কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা। কিন্তু তিন ডাকাতের দেখা নেই। অন্য কোনো দিকে পালিয়েছে ওরা, কিংবা গা-ঢাকা দিয়েছে আশপাশেই।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তিন ডাকাতের দেখা পাওয়া গেল না। বোঝা গেল, অন্যদিকে সরে পড়েছে ওরা।

বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গুঁতো মেরে মেরে আধভাঙা নৌকাটার তলাটা একেবারেই খসিয়ে দিলেন ডাক্তারচাচা। আমাদের পাঁচজনের জন্যে মোটামুটি অক্ষত বাকি একটা নৌকাই যথেষ্ট। নৌকায় চেপে বসলাম আমরা।

চলতে চলতে ডাক্তরচাচা জানালেন, এখন আমরা বেন গানের গুহায় চলেছি। ওখানেই মাটির তলায় ফ্লিন্টের সমস্ত ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছে বেন গান। পাইনের গোড়া থেকে ওগুলো ও-ই তুলে নিয়ে গেছে, আমরা ট্রেজার আইল্যাণ্ডে আসার অনেক আগেই। দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে এই কয়দিন তাঁরা বেন গানের গুহাতেই থেকেছেন। ডাকাতদের নজর অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে, বিশেষ করে খামোকা খুন-খারাবি বন্ধ করার জন্যেই গুপ্তধনের নক্সা সিলভারের হাতে তুলে দিয়ে এসেছেন ডাক্তারচাচা। তাছাড়া তখন আর নক্সাটার কোনো মূল্য ছিল না, কারণ ধনরত্ন তো সব আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমি সঙ্গে না থাকলে ডাকাতদেরকে গুলি করারও কোনো প্রয়োজন পড়তো না। ডাকাতদের ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে বেন গানের ফ্লিন্টের অনুকরণে ডাকাডাকির কৌশলটা সত্যিই অভিনব, স্বীকার করলেন ডাক্তার-

চাচা।

গুহার ভেতরে বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছেন জমিদার ট্রেলনী, ক্যাপ্টেন স্মলেট আর জয়েস, কোনো উপায়ে ডাকাতেরা গুহা আর ধনরত্নের খোঁজ জেনে গিয়ে যদি গুহায় হানা দেয়, তো বাধা দেবেন। আমাদের দেখে বেরিয়ে এলেন তাঁরা।

এরপরে কি হলো, সংক্ষেপে শেষ করছি। মাটি খুঁড়ে সমস্ত ধনরত্ন আবার বের করা হলো। অসংখ্য সোনার বাট, তার দাম অনুমান করা আমার সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া আছে ছোট ছোট কয়েক বস্তা মোহর। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের মোহরই আছে : ইংল্যাণ্ড, ফরাসী, স্পেন, পর্তুগাল ইত্যাদি সব দেশের। আছে জর্জ, লুই, ডাবলুন ইত্যাদি সব জাতের মোহর। বিচিত্র আকারের বিচিত্র ওজনের সব মোহর। রাজরাজড়াদের ছবি খোদাই করা মোহরে। কোনটা গোল, কোনটা চারকোণা। কোন কোনটাতে আবার ফুটো করা—ভেতরে চেন ঢুকিয়ে গলায় ঝোলানোর জন্যে।

মোহর, সোনার বাট নিয়ে গিয়ে হিসপানিওলায় তুললাম আমরা। জোয়ার আসায় চরা থেকে নেমে গিয়েছে জাহাজটা, ভাটার সময় আবার আটকেছে, এমনি করে গেছে গত কয়েকটা দিন। প্রায় বদ্ধ খাঁড়ির সংকীর্ণ মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে যেতে পারেনি, কাজেই এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে গিয়েছি আমরা।

পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে প্রচুর মিঠে পানি বোঝাই করে নিয়েছি জাহাজের পিপেগুলোতে। খাবার হিসেবে নিয়েছি শিকার করা বুনো ছাগলের ধোঁয়ায় শুকানো মাংস। আর নিয়েছি প্রচুর বুনো ফলমূল।

মরগান আর তার দলবল আমাদের আক্রমণ করতে আসেনি আর।

সাহসই করেনি। আর করবেইবা কি করে? ওদের গুলিবারুদ নেহাতই সামান্য। এত অল্প রসদ নিয়ে আমাদের আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায়নি আর। ওদেরকে দ্বীপেই নির্বাসন দিয়ে এসেছি আমরা। ডাক্তারচাচা অবশ্য অনেক দয়া দেখিয়েছেন। আসার সময় দুর্গে কয়েক বস্তা ময়দা, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়, ওষুধ, কিছু গুলি-বারুদ ইত্যাদি রেখে এসেছেন তিন ডাকাতের জন্যে। এই দিয়ে যে কয়দিন বাঁচতে পারে তারা, বাঁচুক। সিলভারকে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমরা।

দেশে ফিরে ধনরত্ন সব ভাগাভাগি করা হয়েছে আমাদের মাঝে। আমাদের বলতে আমি, ডাক্তারচাচা, জমিদার ট্রেলনী এই তিনজন। ক্যাপ্টেনকে অভিযানের কয়েক মাসের পুরো বেতন প্রচুর বোনাসসহ বুঝিয়ে দিয়েছেন জমিদার। বেন গানকে এক হাজার পাউণ্ড দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যেই মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে সে, তারপর পথের ভিখিরি। ভিক্ষে করেই কাটিয়েছে জীবনের বাকি দিনগুলো।

আব্রাহাম গ্রেকেও কিছু টাকা দেয়া হয়েছে। সত্যিই ভাল হয়ে গিয়েছে সে। মোটামুটি পড়ালেখা শিখেছে, ব্যবসাও করেছে কিছু-দিন। তারপর একটা চমৎকার জাহাজের আংশিক মালিকানা কিনে নিয়েছে। ওই জাহাজেই মেটের কাজ করে এখন। বিয়ে করেছে, সন্তানের পিতা হয়েছে। সুখেই আছে সে।

যেহেতু আমার প্রাণ রক্ষা করেছে লঙ জন সিলভার, দেশে ফিরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন না ডাক্তারচাচা। বরং কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন, পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিলেন। তবে এই বলে হুঁশিয়ারও করে দিলেন, যদি আমাদের এলাকায় তাকে আবার কখনও দেখা যায়, তাহলে ধরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হবে।

সেই যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে সিলভার, আর কোনো খোঁজ পাইনি তার।

আজও, ভয়ংকর ঝড়ের রাতে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে সাগর, ফুঁসে উঠে তীরে এসে আছড়ে পড়ে উত্তাল ঢেউ, ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠি আমি। খোঁড়া এক জলদস্যু ক্রাচ বগলে নিয়ে তাড়া করে আমাকে। সেই ডাকাতের চেহারার সঙ্গে সিলভারের কোনো মিল নেই। কিন্তু আশ্চর্য!—খোঁড়া দানবের কাঁধে সিলভারের ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের মতোই একটা তোতাপাখি বসা থাকে। কুৎসিত কর্কশ গলায় একটানা চেঁচাতে থাকে ওটা: 'পিসেস অফ এইট, পিসেস অফ এইট, পিসেস অফ এইট...'

—: শেষ :—